Quest

A Bi-lingual Peer Reviewed Academic Journal

Editor

Dr. Aditi Bhattacharya

Editorial Board

Dr. Debasish Pal, Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya,
Dipak Kumar Nath, Sm. Chandana Samanta
Dr. Uttam Purkait, Dr. Momotaj Begam.

Advisory Committee

Dr. Urvi Mukhopadhyaya
Dept. of History, W.B. State University,

Dr. Biswajit Choudhury
Dept. of Applied Chemistry, Indian School of Mines.

Prof. Supriyo Bhattacharya
Dept. of Economics, Kalyani University,

Dr. Manidipa Sanyal
Dept. of Philosophy, Calcutta University,

Dr. Chanchal Dasgupta,
Dept. of Life Science and Biotechnology,
Jadavpur University

Quest

A Bi-lingual Peer Reviewed Academic Journal

Vol-11, 2016-17

ISSN 2319-2151

Printed by :

IMPRESSION
108, Raja Basanta Roy Road,
Kolkata 700 029
Mobile : 9831455695

Published by

Uluberia College
Uluberia, Howrah

Quest

A Bi-lingual Peer Reviewed Academic Journal

2016-17

Vol-11

Uluberia College

Uluberia, Howrah-711 315

Editorial

This year is the 150th Birth Anniversary of Sister Nivedita. The first two articles in this issue of our Academic Journal have been published to remind the readers how India is indebted to this noble lady. We have also devoted one article to the famous poet Sri Samar Sen as this is his Centenary year. The other articles are on a variety of subjects contributed by our faculty members of different disciplines. All the articles have been sent to the reviewers and have been accepted and published after having being reviewed by them. This year we have appealed to the UGC to include this Journal among their enlisted In-house Journals. We are looking forward to a positive response from them. We would indeed be much benefitted in that case and may hope that most of our faculty members will then be more and more motivated to contribute articles. Twelve years have passed since we started our journey. We have been getting along in spite of many problems that we have faced. We hope that with the help of our colleagues, inspiration from the college authority and good support from our readers we can carry on our effort successfully for the years to come.

Note to the Contributors

1. Quest' welcomes research papers / articles from all fields of Learning.
2. The papers or articles not published in elsewhere will be considered.
3. Two copies of double spaced typed article must be sent to the editor.
4. Articles should be prepared for anonymous referring, with proper acknowledgements and self-identifying references removed.
5. Detail footnotes and / references should be given.
6. Articles submitted in English can follow either the American or British punctuation and spelling patterns, but it has to be consistent throughout.
7. Papers / articles not recommended for publication are not returned unless so requested with stamped self-addressed envelope.
8. Editors are not responsible for the views expressed in the Papers / articles.
9. The author will receive one complimentary copy of the Journal.

Publishing Ethics:

The publication of an article in a peer-reviewed journal is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society of society-owned or sponsored journals.

CONTENTS

Part I

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ
সুপ্রিয় ভট্টাচার্য 3

শিক্ষাব্রতী নিবেদিতা ঃ আজকের প্রাসঙ্গিকতা
ড. চিত্রিতা দত্ত সরকার 26

Sister Nivedita in the Reminiscence of Saralabala Sarkar
Dr. Jayashree Sarkar 33

Part II

সমর সেনের কবিতার আঙ্গিক
ড. মমতাজ বেগম 43

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' ঃ 'অন্ধকারের স্বামী' কিংবা 'প্রাণের ঠাকুর'
প্রীতম চক্রবর্ত্তী 49

দেশভাগের ইতিকথাঃঋত্বিক ঘটকের বাংলা নাটক
সৌরভ মণ্ডল 60

সিভিল সোসাইটি, আধিপত্য ঃ ভারতীয় প্রেক্ষাপট
বিশ্বজিৎ বক্সী 73

মন্দির গাত্রে রামায়ণ
ডালিয়া হাজরা 79

Negation or Absence: An Ontological and Epistemological Approach from the Viewpoint of Indian and Western philosophy.
Dr. Aditi Bhattacharya 83

Translating Imagination: The Poetics of Transnational Geo-politics in Amitav Ghosh's novel *The Hungry Tide*
Debolina Byaborto 92

Women And Children Trafficking In West Bengal
– A Severe Crime Against Humanity
Jayjit Mondal 118

Gravitational Waves in LIGO
Dr. Lina Paria 131

Borospherene : The New Boron Buckyball
Dr. Ratna Bandyopadhyay 137

Comparing Monetary Poverty and Multidimensional Poverty:
A Study based on NSSO Unit Level Data in the Context of the Backward Region of West Bengal
Jagabandhu Mandal, Dr. Pinaki Das 140

Self-Help Groups in India – A Study
Paromita Dutta 159

PART - I

আমন্ত্রিত রচনা

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ

সুপ্রিয় ভট্টাচার্য

(এক)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্বে শ্রীঅরবিন্দ এবং নিবেদিতার ভূমিকা এবং যোগাযোগ সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের প্রারম্ভিক ভূমিকাটুকু স্মরণ করে নিতে চাই এবং তারপর নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং শেষে নিবেদিতার নিজস্ব ভূমিকার কয়েকটি দিক নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। আমরা জানি জাতীয় কংগ্রেস দুটি দল ছিল - নরমপন্থী বা Moderate, দ্বিতীয় হল চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদী (Extremist or Nationalist)। নরমপন্থী দলের বিখ্যাত নেতারা হলেন গোপালকৃষ্ণ গোখেল, স্যর ফিরোজ শাহ মেহতা, মহাদেব গোবিন্দ, রাণাডে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয়তাবাদী দলের শিরোমণি ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, তাঁর সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষ (পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ), বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, আর এই দুই দলের মধ্যে মধ্যমণি হয়েছিলেন বরণীয় নেতা দাদাভাই নৌরজী। নরমপন্থী নেতারা চেয়েছিলেন Colonial form of Self-Government', অর্থাৎ উপনিবেশ হিসেবে থেকে স্বায়ত্তশাসন; বরাবর ব্রিটিশ শাসনকাঠামোর মধ্যে থেকেই তাঁরা নানা সংস্কার দাবি করেছেন 'আবেদন-নিবেদনের'(mendicant policy) নীতি গ্রহণ করে। তাঁরা তখন ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাননি এবং গোখেল সাধারণ ভারতবাসীর প্রস্তুতির নিদারুণ অভাব লক্ষ করে এর অবসান ঘটানোও সম্ভব নয় বলে ঘোষণা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ এর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করলেন এই ঘোষণা করে যে, তাঁরা অর্থাৎ চরমপন্থীরা চান 'Absolute Autonomy free from Foreign Control' বিদেশী শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি এবং স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা। ১৮৯৩ সালে প্রথম 'Indu Prakash' কাগজে 'New lamps for old' শীর্ষক শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধাবলীতে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেস মডারেট নেতাদের তীব্র সমালোচনা শুরু করলেন। কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিরুদ্ধে একুশ বছরের এক যুবকের এইরকম দুঃসাহসিক রচনা সেদিন শুধু ব্রিটিশ শাসকদের সন্ত্রস্ত করেনি, সেই সঙ্গে তা আমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল নরমপন্থী (মডারেট) নেতাদের, যার জন্য এই লেখা একসময় বন্ধ করে দিতে হয় শ্রীঅরবিন্দকে সম্পাদকের অনুরোধে। সেই লেখাগুলিতে শ্রীঅরবিন্দই প্রথম ঘোষণা

করেন কংগ্রেস মুষ্টিমেয় 'এলিট' নেতৃবৃন্দের দখলে, কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের (বিশেষ করে 'Proletariat' শব্দটি শ্রীঅরবিন্দ ব্যবহার করেন) কোনো সংযোগ নেই এবং কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের 'প্রতিবাদ-আবেদনের' রাস্তা ছেড়ে এবার অসহযোগের পথ ধরে 'পূর্ণ' স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হতে হবে এবং দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে যে শক্তি, তাকে জাগানোই হবে কংগ্রেসের কর্তব্য। স্বদেশী যুগের সাংবাদিকতার ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের এই রচনাগুলি এবং পরবর্তীকালে 'বন্দেমাতরম্' এবং 'কর্মযোগিন'পত্রিকায় লেখাগুলি অমর হয়ে থাকবে প্রখর ইতিহাস চেতনা, নির্ভীক কণ্ঠস্বর, ব্যবহারিক প্রজ্ঞা ও দ্রষ্টার দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। তেমনি তেজীয়ান এর ভাষা - ইংল্যাণ্ডের লোকসভায় দাঁড়িয়ে **র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড** যেমন বলেছিলেন ঃ 'the most excellent English'।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদ প্রধানত তিনটি ধারায় পরিচালিত ছিল। 'Sri Aurobindo on Himself' গ্রন্থ অবলম্বনে **প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা** এই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দিয়েছেন ঃ 'প্রথমত, গুপ্ত বিপ্লব প্রচার ও সংগঠন, যাহার প্রধান উদ্দেশ্য রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করা। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্য প্রচারের দ্বারা সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। অরবিন্দ যখন রাজনীতিতে যোগদান করেন তখন অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকট এই স্বাধীনতার আদর্শ অবাস্তব ও অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইত। তৃতীয়ত, সংঘবদ্ধ জনসাধারণ কর্তৃক অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা প্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধরূপে সরকারের বিরোধিতা এবং বৈদেশিক শাসনের ভিত্তি শিথিল করিবার প্রচেষ্টা।"

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি বাংলায় এক সর্বাত্মক বিপ্লব ধীরে ধীরে প্রস্তুত করবার এক দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিপ্লব-ইচ্ছা যে কত গভীর ছিল তার এক প্রাণস্পর্শী পরিচয় মেলে স্ত্রী মৃণালিনীকে লেখা তাঁরই একটি চিঠিতে - ''অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলি মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা-র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তা হইলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিত বসে, স্ত্রী-পুত্রের সহিত আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?" (দ্রঃ শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা; শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী)

দেশকে এইভাবে মা হিসাবে কল্পনা করা, এটি চরমপন্থী বিপ্লবীদের ভিতর চারিয়ে গেছিল। এ প্রসঙ্গে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য - ''যে ব্যক্তি স্বদেশকে জড় পদার্থরূপে দেখার পরিবর্তে সাক্ষাৎ জননীর ন্যায় ভক্তি করে, পূজা করে, তাঁহার সহিত নিবেদিতার মতের এবং মনের মিলন ঘটা বিচিত্র নয়। দেশের প্রতি

অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিবেদিতা পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনই কথাপ্রসঙ্গে বাহির হইতে দেখিতে শান্তশিষ্ট, নিরীহ ব্যক্তির এই মনোভাব নিশ্চিত তিনি উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। তাঁহার লোক চিনিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। সুতরাং বৈদেশিক শাসন হইতে দেশমাতৃকার মুক্তি লাভের জন্য অরবিন্দের কর্মপ্রণালীর প্রতি নিবেদিতার সহানুভূতি এবং সমর্থন খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।"

এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার ফরাসী জীবনীকার লিজেল রেমঁ নিবেদিতার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রেরণা সম্বন্ধে স্বামীজীর ভূমিকার একটি চমকপ্রদ তথ্য উল্লেখ করেছেন শংকরীপ্রসাদ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে। এখানে বলে নেওয়া ভাল রেমঁ নিবেদিতার জীবনীটি লিখেছিলেন নিবেদিতারই ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী আর এক মহীয়সী নারী জোসেফিন ম্যাকলিওডের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, কারণ জোসেফিন ম্যাকলিওডকে নিবেদিতা বহু চিঠিতে তাঁর কর্মকাণ্ডের খুঁটিনাটি জানাতেন। উল্লেখিত চিঠিতে রেমঁ লিখেছেন শংকরীপ্রসাদকে, ''১৯৩৭ সালে আমি মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে ইংলণ্ডে তাঁর স্টাটফোর্ড অন অ্যাভন-এর বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জ্যা এবরোঁ সঙ্গে ছিলেন। মিস ম্যাকলাউড ডেস্ক খুলে তাঁর ড্রয়ারভর্তি নিবেদিতার চিঠি আমাদের দেখালেন। তাদের মধ্যে কতকগুলি দারুণ আগ্নেয় – বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগের সংবাদ সেগুলিতে ছিল। মিস ম্যাকলাউড সেগুলিকে নষ্ট করে ফেলেছিলেন। তিনি বললেন ঃ নিবেদিতা এইসব কাজ স্বামীজীর নির্দেশে গ্রহণ করেছিলেন - ভারতে নিবেদিতার সঙ্গে অন্যান্যদের এই বিষয়ের যোগাযোগ স্বয়ং স্বামীজীই করে দিয়েছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে নিজের রাজনৈতিক কর্ম সমাধা করার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, নিবেদিতা এই কাজ করতে সমর্থ। লণ্ডনে যে সব বস্তিতে নিবেদিতার কর্মক্ষেত্র ছিল, সেসব জায়গায় স্বামীজী নিবেদিতার সঙ্গে গিয়েছিলেন (শোযোক্ত সংবাদ মিসেস উইলসন ও মি. স্টার্ডির সূত্রে প্রাপ্ত)।"

ভারতের জাতীয় সংগ্রামের মুক্তির ইতিহাস ১৯০২ থেকে ১৯১১ এই কালখণ্ড টিকে কেউ কেউ অভিহিত করেছেন 'নিবেদিতা-যুগ' কারণ এই সময়টিতে মুক্তি আন্দোলনে নিবেদিতাকে আমরা দেখি এক সক্রিয় ভূমিকায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া ভাল ঃ সেটি এই যে, ভারতে আসার আগে আয়ার্ল্যাণ্ডে আইরিশ বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপের সঙ্গে যেহেতু নিবেদিতা জড়িত ছিলেন, অতএব এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে ভারতের মাটিতে পা দিয়েই নিবেদিতা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়েন। রন্তিদেব সেনগুপ্ত তাঁর নিবেদিতা সম্পর্কিত গবেষণায় (দ্রঃ সাপ্তাহিক বর্তমান) লিখেছেন, আসল ঘটনা তা নয়। নিবেদিতা যখন প্রথম ভারতে আসেন তখন ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। ১৯০১ সালে লাইসোঁ-তে ছুটি

কাটানোর সময় বিখ্যাত রাশিয়ান বিপ্লবী পিটার ক্রুপটকিনের লেখা পড়ে এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে পারেন এবং ১৯০২ সালে ভারতে ফিরে এসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। এই পর্বেই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে, এর আগেই স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম আর ঐতিহ্য সম্বন্ধে নিবেদিতার প্রথম পাঠ নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। ''The Master as I saw Him ''এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

স্বামীজীর প্রয়াণের (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) পর নিবেদিতা যখন সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করছেন, এবং স্বামীজীর জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনার প্রচার করছেন, সেই পর্বে বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ। সে সময়টি হল ১৯০২ সালের অক্টোবর মাস - যে সময় নিবেদিতা বরোদায় এসে পৌঁছন। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদায় মহারাজা গাইকোয়াড়ের কাছে কর্মরত। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় প্রসঙ্গে 'Sri Aurobindo on Himself' গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায় পাই - ''নিবেদিতা বরোদায় গাইকোয়াড় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই। তবে তিনি রাজ-অতিথি রূপে বরোদায় বাস করেছিলেন। আমি খাসী-রাওয়ের সঙ্গে তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে যাই। স্টেশন থেকে শহরে আসবার পথে নিবেদিতা যখন কলেজের বাড়ি এবং সুউচ্চ গম্বুজগুলোর সৌন্দর্যহীনতার তীব্র নিন্দা ও নিকটস্থ ধর্মশালার প্রশংসা করেন, তখন খাসী-রাও অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই মহিলা সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ।" বরোদায় নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও বৈপ্লবিক ক্ষেত্রে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সহযোগের বিষয়টি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমেই বলে নিয়েছেন - ''তাঁর (নিবেদিতা) সঙ্গে আমার সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে গোপন বৈপ্লবিক ক্ষেত্রেই। আমি আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, তিনি তাঁর কাজ নিয়ে এবং বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার বা একত্রে সিদ্ধান্ত করার কোনো ঘটনা ঘটেনি।" এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বরোদায় অবস্থানকালেই মহারাজ সয়াজি রাওকে বিপ্লবের কাজে সহায়তা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে ছিলেন নিবেদিতা। সয়াজি রাওয়ের সঙ্গে নিবেদিতার এই সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীঅরবিন্দ উপস্থিত ছিলেন। Sri Aurobina on Himself বইতে দেখি শ্রীঅরবিন্দ বলছেন - ''...ঐকালে আমি তাঁর (নিবেদিতার) Kali the Mother গ্রন্থ পড়ে মোহিত। আমার মনে হয় বইটির বিষয় আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম। তিনি বলেন, তিনিও শুনেছেন যে আমি শক্তি উপাসক। তার দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছিলেন, আমি তাঁরই মতো গুপ্ত বিপ্লবীদলের অন্তর্ভুক্ত। বরোদায় মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি তাঁকে গুপ্ত বিপ্লবে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন - সেই সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি মহারাজকে বলেন, তিনি আমার

মারফত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। সয়াজি রাও যথেষ্টই চতুর ছিলেন, এই রকম মারাত্মক কাজে ঝাঁপ দেবার পাত্র ছিলেন না, তিনি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোনো কথাই বলেননি।"

নিবেদিতার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব বৈপ্লবিক কাজকর্মের, দৈনন্দিন কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার বৈপ্লবিক কাজকর্মের খবর রাখতেন। নিবেদিতাও তাঁর সম্পর্কে খবারখবর রাখতেন। নিবেদিতার বৈপ্লবিক কাজকর্ম সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন - ''বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে তিনি (নিবেদিতা) ছিলেন অন্যতম। লোকের সংস্পর্শে আসবার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। খোলাখুলি সরল প্রকৃতির মানুষ, বিপ্লবের কথা সকলকে বলতেন, কোনো ঢাকাঢুকি ছিল না তাঁর মাঝে। যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই – তাঁর খাঁটি স্বরূপ বেরিয়ে আসত। তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হত। যোগ-সাধনা করতেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল কাজ যেন এটা, একেই বলেন আগুন। তাঁর বই, 'Kali the Mother' উদ্দীপনাপূর্ণ বই, তেমনি বিদ্রোহমূলক, অহিংস নয়। রাজপুতনায় ঠাকুরদের কাছে গিয়ে নিবেদিতা বিদ্রোহ প্রচার করতেন।"

তবে একটা কথা পরিস্কার যে, শ্রীঅরবিন্দ এবং নিবেদিতা উভয়েই উভয়ের সহযোগী ছিলেন। এর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় Sri Aurobindo on Himself গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দের দেওয়া একটি তথ্যে ঃ তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের কাজের ভিতর বাংলার সব বৈপ্লবিক গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করার একটি প্রয়াস শ্রীঅরবিন্দ নিয়েছিলেন। তারই অঙ্গ হিসাবে একটি বিপ্লবী পরিষদও শ্রীঅরবিন্দ গঠন করেছিলেন। এই পরিষদে অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নিবেদিতাকেও রেখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। অবশ্য এই বিপ্লবী পরিষদ শেষ পর্যন্ত কোনো সার্থক পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। তবুও একটি কথা বলা প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দ-গোষ্ঠীর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের একটা প্রমাণ মেলে শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের দেওয়া কিছু তথ্যে। বারিন্দ্রকুমার জানিয়েছেন - ''নিবেদিতা আমার বাংলায় আসার আগেই ১০৮ নং Upper Circular Road-এর গুপ্ত কেন্দ্রকে তাঁর পুস্তকাগার (লাইব্রেরী) দিয়ে ফেলেছিলেন। আমিই হলাম সার্কুলার রোডের এই রাজনৈতিক স্কুলের প্রথম ছাত্র। এই লাইব্রেরীই ছিল প্রাণ ও প্রেরণার উৎসমূল। নিবেদিতার সঙ্গে যতীনদার (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) কথাই ছিল, এই বইগুলি অবলম্বনে সেখানে রাজনীতি শেখবার এবং কর্মী গড়বার স্কুল গড়তে হবে। সেই স্কুলে বা Study Circle-এ বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস, জীবনী অর্থনীতি ধর্ম সমাজ ও জাতির উত্থান-পতনের নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ও শিক্ষা দেওয়া হবে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রচারক হয়ে ভারতের নবজাগরণের চারণ হয়ে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বিপ্লবের বীজ বহন করে দেশকে

অসংখ্য বিপ্লবী কেন্দ্রে ছেয়ে ফেলবে। ... তারপর ক্রমে জুটল এসে দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ইন্দ্রনাথ নন্দী - এই ধরনের অনেক ভাবোন্মাদ মানুষ। ... আমাদের দলে বহু শিক্ষিত লোক ছিলেন বলে - অরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি চিন্তাশীল দেশব্রতীর নির্দেশ ও গভীর চিন্তা আমাদের পিছনে থাকায় - আমাদেরই মধ্যে বাংলার প্রথম সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী পরিকল্পনা নিয়ে চলবার অনুপ্রেরণা জেগেছিল।" (দ্রঃ রন্তিদেব সেনগুপ্ত - সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৬.১১.১৬)

স্বামীজীর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের একটি স্মৃতিচারণও এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন - ''ভগিনী (নিবেদিতা) জোসেফ মাৎসিনী-র আত্মজীবনীর প্রথম ভাগ বিপ্লবী দলে দান করেছিলেন। এর মধ্যে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ও পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ ছিল। এই সকল বই আমাদের এক সহকর্মী কেশবচন্দ্র গুপ্তের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। ... কেশব আলিপুর মামলার কালে গা ঢাকা দেবার আগে অন্যদের কাছে বইগুলি রেখে যায়। সারা দেশে পুলিশ তল্লাসের কালে বইগুলি একে একে বেরিয়ে পড়ে। নিবেদিতা প্রায়ই বলতেন, 'আমার বইগুলি এক এক করে আবির্ভূত হচ্ছে।' ''এই লেখা থেকে বোঝা যায় নিবেদিতার সঙ্গে বিপ্লবী দলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) বিপ্লবী শিষ্য এবং সহকর্মী নলিনীকান্ত কর তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, ''যতীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন।" নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে যতীন্দ্রনাথের পৌত্র পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিবেদিতার সঙ্গে বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। (দ্রঃ রন্তিদেব সেনগুপ্ত - সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৬.১১.১৬)

স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রী অরবিন্দ ও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগের পরিচয় মেলে আরো কিছু ঘটনায়। আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা অভিযুক্ত হন, তারপর চিত্তরঞ্জন দাসের সওয়াল এবং বিচারক বীচক্রফ্টের বিচারে শ্রীঅরবিন্দ খালাস পান। এতে নিবেদিতা চিত্তরঞ্জনকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। এই মামলায় যাঁরা আন্দামানে নির্বাসিত হয়েছিলেন তাঁদের ভিতর নয়জন মুক্তি পান ১৯১০-এর ৯ই জানুয়ারী। এ-খবরে নিবেদিতা এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ে এই উপলক্ষে উৎসব পালিত হয়েছিল। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রামা লিখেছেন, ''নিবেদিতার সেদিন কী আনন্দ। বিদ্যালয় গৃহদ্বারে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের চিহ্নস্বরূপ পূর্ণকুম্ভ ও কলাগাছ রাখা হইল এবং আনন্দের দিন বলিয়া বিদ্যালয়ে মেয়েদের ছুটি দেওয়া হইল। নির্বাসিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন ছিলেন ব্রাহ্ম-প্রচারক, অতিশয় ধর্মভীরু। তাঁহার নির্বাসনে পরিবারস্থ স্ত্রী, পুত্র সকলের দুর্গতির সীমা ছিল না। নিবেদিতার মহৎ প্রাণ ইহাদের বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল এবং তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তির মুক্তির সংবাদে তাঁহার মনে হইয়াছিল যেন বহুদিন পরে তাঁহার নিজের পিতা

স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।"

নিবেদিতার বিভিন্ন চিঠিতে শ্রীঅববিন্দের কিছু উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একটি বিষয় আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে - সেটি হল শ্রীঅরবিন্দের সেই সময়ের রচনা ও রচনারীতির সম্বন্ধে নিবেদিতার অকুণ্ঠ প্রশংসা। আমরা জানি নিবেদিতা স্বয়ং অতি উচ্চস্তরের লেখিকা এবং সে-কারণেই অন্যের রচনার বিষয় ও শৈলী সম্বন্ধে নিবেদিতার সিদ্ধান্ত ছিল কঠোর। কিন্তু শ্রী অরবিন্দের স্বদেশীযুগের যে-সমস্ত রচনা সে-সম্বন্ধে নিবেদিতা তাঁর প্রশস্তি জ্ঞাপনে অকুণ্ঠ। সমকালীন ভারতীয় লেখকদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজীতে লিখেছেন, তার মধ্যে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। Modern Review - এর June 1909 সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের 'To the Sea' কবিতাটি সম্বন্ধে নিবেদিতা ২৪-শে জুন The Statesman পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক Ratcliff ও তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন,''Modern Review এ অপূর্ব কবিতা 'To the Sea' বিপিনের কারাগারের রচনা ফসলের তুলনায় কত না পৃথক।" কর্মযোগিনে শ্রী অরবিন্দের রচনা সম্বন্ধে Ratcliff -কে ২০ জানুয়ারী, ১৯১০ তারিখে নিবেদিতা লিখছেন - ''তুমি যেন প্রতি সপ্তাহে কর্মযোগিন্ পাও, এটা কীভাবে যে চাইছি, কী বলব! আমার মতে, ওতে চিন্তা ও স্টাইলের একেবারে বিজয়ী রূপ। অরবিন্দ অসাধারণ। অপরদিকে অবশ্য স্বীকার করতে হবে, দল চালাতে হলে কোন মানুষের পক্ষে তার আদর্শকে তরল করে নিতেই হয়।" (দ্রঃ নিবেদিতা লোকমাতা - শঙ্করী প্রসাদ বসু ও নিবেদিতার 'collected letters')

গ্রেপ্তার হবার আগে 'New Lamps for Old' শীর্ষক রচনাবলীতে (তখন সদ্য কেম্ব্রিজ ফেরত তরুণ শ্রীঅরবিন্দের বয়স মাত্র২১ বছর) এবং 'Bande Mataram' পত্রিকায় পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে আপোসহীন প্রচারক এবং আইনভঙ্গের প্ররোচক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। পরবতীকালে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি 'Karmoyogin' পত্রিকায় একটু পরিবর্তিত নীতি গ্রহণ করেছিলেন পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে - এই পর্বে দেখি তিনি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা আইন রক্ষা করে চলবার নির্দেশও দিচ্ছেন। হয়তো এদিকটি লক্ষ করেই নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক 'আদর্শকে তরল করে' উপস্থিত করার কথা বলেছিলেন। যাই হোক, একটা কথা অনস্বীকার্য। নিবেদিতা মোটের উপর শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তামূলক রচনা সম্পর্কে এতটাই উৎসাহী ছিলেন যে, সে'গুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং কাজটা যেহেতু সহজ ছিল না, সেজন্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনুরোধ করেছেন সাহায্যের জন্য। ২৬শে জুন ১৯০৯ র‍্যাট্‌ক্লিফকে লিখছেন ঃ ''সম্ভব হলে অরবিন্দের প্রকাশিত রচনাগুলি, আর সেই সঙ্গে বিচারের কালে উপস্থাপিত অন্য জিনিসগুলি নিয়ে একটি বই প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে - যার শেষে থাকবে খাঁটি হিন্দুধর্মের অসাধারণ নমুনা -

ইংরাজীতে 'To the Sea', ভূমিকা অংশে থাকবে বিচারের বিবরণ, সওয়াল ও জবাবের নির্বাচিত অংশ এবং বিচারপতি কৃত সারসংক্ষেপ-বিবরণ। সেইসঙ্গে Modern Review-তে প্রকাশিত এই ছবিটি। ইংলণ্ড থেকে প্রকাশ করতে পারলেই ভাল - তাতে যদি খরচ দিতে হয়, তবু। তুমি কি ক্রুপটকিনের সঙ্গে যোগসাজসে কোনো প্রকাশক জোগাড় করতে পারো - হেইন্‌ম্যান বা অন্য কাউকে? ইংলন্ডে প্রকাশের সুবিধা তুমি বুঝবে, আর পুস্তকটি তৈরী হয়ে গেলে তুমি সম্ভবতঃ সাজেশন দিতে রাজী হবে।"

স্বয়ং র‍্যাটক্লিফ শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' ও 'কর্মযোগিন'-এ প্রকাশিত রচনাগুলি সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত। এই লেখাগুলি সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ণ জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার ইতিহাস চিরস্মরণীয় - ''(These writings) are marked by a brilliance and pungency, not hitherto attained in the Indian Press." নিবেদিতার নিজস্ব এক জাতীয়তাবাদী দর্শন ছিল, সেটি আমরা একটু পরে আলোচনা করব। এই জাতীয়তাবাদী দর্শন সম্পর্কে নিবেদিতা ১৮ই অগস্ট, ১৯১০ র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন, ''বিবেকানন্দের হৃদয় একে সৃষ্টি করেছে। ... জগদীশচন্দ্র বসু এর মর্ম বোঝেন, তবে নিষ্ক্রিয়ভাবে; তিনি জনপ্রিয় নেতা নন। মারাঠা (গোখেল) বোঝে কিনা সন্দেহ।" নিবেদিতা এখানে শ্রীঅরবিন্দকেই গবেষক শংকরী প্রসাদ বসুর ভাষায় ''উপলব্ধি ও প্রকাশের সামর্থ্য-গৌরব দিয়েছেন"; নিবেদিতার সিদ্ধান্ত ঃ ''অরবিন্দ ঘোষই একমাত্র ভারতীয় মনস্বী পুরুষ যিনি জাতীয়তাকে সৃষ্টিশীল চরিত্রে আয়ত্ত করতে পেরেছেন।"

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর শ্রীঅরবিন্দ যখন 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় তাঁর জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও কর্মকৌশল বোঝাচ্ছিলেন, তখন দ্বিতীয়বার আবার তাঁর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা বিষয়ে নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে সতর্ক করেন। এ বিষয়ে ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ তারিখে Sri Aurobindo on Himself গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন ঃ (''নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে) আমার এই প্রকার এক সাক্ষাতের কালে তিনি (নিবেদিতা) আমাকে জানালেন - সরকার আমাকে চালান দেবার মতলব করেছে। তিনি চান, আমি যেন গা ঢাকা দিই, কিংবা বৃটিশ-ভারত ত্যাগ করি, এবং বাইরে থেকে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাই। ... আমি তাঁকে বললাম, ঐ সাজেশন গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, তার বদলে কর্মযোগিন-এ একটা খোলা চিঠি লিখব যা আমার ধারণা সরকারকে প্রতিনিবৃত্ত করবে। সে কাজ করা হয়েছিল। পরে যখন তাঁর (নিবেদিতার) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তিনি বললেন, আমার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এবং আমাকে চালান দেবার বাসনা পরিত্যক্ত।"

এই খোলা চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ স্বাধীনতার কথা এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি

(passive resistance) এবং বয়কটের কথাও বলেছিলেন। কিন্তু প্রথম যুগে আন্দোলনকালে বয়কটকে তিনি বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের হাতিয়ার বলেছিলেন, কিন্তু কর্মযোগিন পর্বে মনে হয় বয়কটকে শুধু আত্ম-স্বাতন্ত্র্য লাভের উপায়রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। মডারেট দলের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার কথাও কর্মযোগিন-এ ছিল। সেইসঙ্গে আরো একটা জিনিস লক্ষণীয় ঃ বন্দেমাতরম্-পর্বে শ্রীঅরবিন্দ আপোসহীন সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেছেন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে, কিন্তু জেল থেকে মুক্তি পাবার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি কিছুটা নিয়মতান্ত্রিক পন্থার অনুসরণের কথাও বলেছেন ঃ A respect for the law is a necessary quality for endurance as a nation and it has always been a marked characteristic of the Indian people. We must therefore scrupulously observe the Law while taking every advantage both of the protection it gives and the lattitude it still leaves for pushing forward our cause and our propaganda. With these stray assassinations which have troubled the country we have no concern, and, having once clearly and firmly dissociated ourselves from them, we need notice them no further. They are the rank noxious fruit of a rank and noxious policy and until authors of that policy turn from their errors, no human power can prevent the poison-tree from bearing according to it kind."

দেখতে পাচ্ছি শ্রীঅরবিন্দ বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এটি তাঁর কারাগার থেকে মুক্তির পর অনুসৃত নীতি বলে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কারো কারো (শংকরী প্রসাদ বসু যাঁর অন্যতম) মনে হয়েছে। কিন্তু চারুচন্দ্র দত্তের বিখ্যাত গ্রন্থ 'পুরানো কথা' এবং বারীন্দ্র কুমার ঘোষের 'আত্মকাহিনী' গ্রন্থে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় শ্রীঅরবিন্দ বৈপ্লবিক কাজকর্ম ও জাতীয়তাবাদের নাম করে ইংরেজ রাজপুরুষদের হত্যাকাণ্ড আদৌ সমর্থন করেননি (যেমন কিংসফোর্ড হত্যার প্রয়াস)। তিনি গঠনমূলকভাবে দেশকে প্রস্তুত করা এবং নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করার জন্য স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রস্তুত হওয়া - এইদিকেই দেশবাসীকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে একটি বক্তৃতায় নিয়মতান্ত্রিক পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাসনা পরিষ্কার লক্ষ করি ঃ

"Our ideal of Swaraj involves no hatred to any other nation nor of the administration which is now established by law in this country .... Our methods are to ... evolve a government of our own for our

internal affairs so far that could be done without disobeying the law or questioning the legal authority or the bureaucratic administration ... The Nationalist Party stood for democracy, constitutionalism and progress." (Sri Aurobindo's Speeches, Sri Aurobindo Ashram : Pondicherry, 1952). তবে এ কথা ঠিক যে, 'খোলা চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ একটা কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন - সেটি হল ঃ 'No Co-operation without control' (কোনো ক্ষমতা না পেলে, কোনো সহযোগিতা নয়)।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিবেদিতা এই আশংকা করেছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের লেখা 'খোলা চিঠি' (Open Letter) ভারত-সচিব লর্ড মর্লের কাছে যাতে না পৌঁছয়, সেজন্য ভারতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইংরেজ শাসককুল চেষ্টা চালাবে। নিবেদিতা তাই শ্রীঅরবিন্দের এই খোলা চিঠিটি ইংলণ্ডের নানা স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন - কারণ তিনি চেয়েছিলেন, Nationalist-এর রীতিনীতি সম্বন্ধে ঊর্ধ্বতন মহলকে ভুল বুঝিয়ে যাতে শ্রীঅরবিন্দকে চালান দেবার অনুমতি আদায় করা না যায়। তাতেও থেমে না গিয়ে নিবেদিতা তাঁর ইংলণ্ডের বন্ধুবান্ধবদের বোঝাতে চেষ্টা করেন - ভিতরে বাইরে চাপ দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তার ঠেকাতে তাঁরা যেন চেষ্টা করেন। র‍্যাট্‌ক্লিফ-দম্পতিকে নিবেদিতা ৫.৮.১৯০৯ তারিখে লেখেন ঃ ''মনে হয়, এই সপ্তাহেই তোমাদের কাছে কর্মযোগিন পৌঁছবে। আমি অফিসে তা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে যে 'খোলা চিঠি' আছে, তা ও-মহলে চাঞ্চল্য ঘটিয়েছে। ওর কপি, আমার ধারণা, মর্লে ও সকল সাংবাদিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেগুলি পৌঁছতে না পারে। ... খোলা চিঠির লেখককে যদি চালান দেওয়া হয়, তাহলে দিন দুয়েকের মধ্যেই তা ঘটবে, এবং এই চিঠি পৌঁছবার আগে তুমি তা জানতে পারবে। তোমার ব্যবহারের জন্য তোমাকে কর্মযোগিন-এর আর একটা সংখ্যা পাঠাতে চেষ্টা করব। ... অরবিন্দ ঘোষকে যদি সত্যই চালান দেওয়া হয় তাহলে তার আসল কারণ তুমি অবশ্যই বুঝবে - নয়জন নেতাকে চালান দেবার পরে সমস্ত দেশ ঝিমিয়ে পড়েছিল, আর তা দেখে সরকার তার মহাপ্রজ্ঞার মূল্য বুঝেছিল। আবার যে মুহূর্তে আলিপুর বোমার মামলার বন্দীরা মুক্ত রয়েছে অমনি পুনর্জাগরণের লক্ষণ দেখা গেছে। সুতরাং নীতিকথা এইঃ জাগরণের কর্তাটিকে পাকড়াও, ফাটকে ফেলে দাও। এই পদ্ধতি তাদের অনন্তকাল চালিয়ে যেতে হবে। নৈতিক নয় - কেবল ফৌজদারি আইনের শক্তি। একটা সরকার কতদিন এই নীতি ধরে চলতে পারে? আর তাদের পক্ষে এমন নীতি আরম্ভ করার অর্থই হয় না যদি না একে চূড়ান্তভাবে সর্বাত্মক করে।''

শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকারের চেষ্টা অব্যাহত ছিলই। শ্রীঅরবিন্দ তা

জানতেন। তাই তিনি ২৫শে ডিসেম্বর আবার একটা খোলা চিঠি কর্মযোগিন-এ প্রকাশ করলেন, তার মধ্যে নিজের মত, পথ সরকার ও সকলের কাছে পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করলেন। এখানেও তাঁর বক্তব্যের সুর বন্দেমাতরম্ পর্বের থেকে অনেক কম। তবুও এর অংশবিশেষ সরকারের কাছে রাজদ্রোহকর ঠেকেছিল। সেইটি লক্ষ করে নিবেদিতা লিখেছেন, সরকার শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তারের পরিকল্পনা করেন। এই চেষ্টাকে ঠেকাতে নিবেদিতা উঠে-পড়ে লাগেন। শ্রীঅরবিন্দের ঐ প্রবন্ধটি নানা স্থানে পাঠিয়ে তিনি ভারত-বন্ধুদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, ঐ প্রবন্ধটির কারণে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হলে তারা যেন বিরোধিতা করেন।

শ্রীঅরবিন্দ নিজে লিখে গেছেন নিজের ভিতরে ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে তিনি প্রথমে চন্দননগর এবং পরে পণ্ডিচেরী চলে যান। এখানে যেটি বিশেষভাবে স্মরণীয় তা হল *শ্রীঅরবিন্দ আর কোনো তদানীন্তন বিখ্যাত লেখক বা রাজনৈতিক নেতার উপর দায়িত্ব না দিয়ে নিবেদিতার উপর কর্মযোগিন চালাবার ভার দিয়ে যান।* নিবেদিতা সে দায়িত্ব যথাযোগ্য দক্ষতায় কিছুকাল পালন করে গেছেন। সেখানে প্রকাশিত নিবেদিতার রচনাগুলি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

(দুই)

এবার আমরা নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথায় আসছি। ১৯২৯ সনে মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় হেমচন্দ্র কানুনগো-র একটি লেখা থেকে আমরা কিছু তথ্য পাই। হেমচন্দ্র লিখেছেন - "১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে, বোধ হয় জুন মাসে, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ভগিনী নিবেদিতা অ-বাবুর চেষ্টায় মেদিনীপুরে এসেছিলেন। ... তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য মেদিনীপুর স্টেশনে সমিতির সভ্যগণ প্রায় সকলে এবং অন্যান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। গাড়ী স্টেশনে থামলে তাঁকে দেখে অনেকে হিপ-হিপ হুররে বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। এই না শুনে তিনি আঁতকে উঠলেন এবং হাত নেড়ে চুপ করতে ঈঙ্গিত করলেন। আমরা নিশ্চয় অবাক হয়েছিলাম। তখন তিনি বুঝিয়ে বলেন যে, হিপ-হিপ হুররে ইংরেজ জাতির জাতীয় উল্লাসধ্বনি, ভারতবাসীর উল্লাসধ্বনি ইহা হওয়া উচিত নহে। তখনও 'বন্দেমারতম্' ব্যবহার হয়নি। যখন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, আমাদের তেমন কিছুই নাই, তখন তিনি নিজের হাত তুলে তিনবার বলেছিলেন - 'ওয়া গুরুজী কি ফতে, বোল্ বাবুজী কা খালসা।' আমরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। ... একজন ও হেন ইংরেজ মহিলাকে, আমরা এই ইংরেজ তাড়ানোর সহায় মনে করে, অন্তত আমাদের মিইয়ে যাওয়া উদ্যম ও আগ্রহ আবার তাজা হয়ে উঠল।...

''তিনি এখানে পাঁচদিন ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধর্মের মধ্যে দিয়ে রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন; সকালে সে সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রথমদিনের বক্তৃতায় অনেক

লোক এসেছিল, বক্তৃতা শেষ হবার পূর্বে অনেকে সরে পড়েছিল। সেজন্য স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত একজন উচ্চ কর্মচারী তাঁকে বলেছিলেন - 'আপনার বক্তৃতায় রাজনীতির তীব্রতা বেশি ছিল বলে অনেকে সরে পড়েছিলেন। পরের বক্তৃতায় হয়তো লোক হবে না।' ইহার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি আমায় ভয় দেখাবেন না। আমার শিরাতে স্বাধীন জাতির রক্ত এখনও প্রবাহিত, যারা ভয় পায় আমার বক্তৃতা তাদের জন্য নয়।' ... তাঁকে দিয়েই আমাদের আখড়ার উদ্বোধন কার্য সমাধা হয়েছিল। তাতে তিনি যেরূপ আগ্রহ ও উচ্ছাস দেখিয়েছিলেন, তা মনে হলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় প্রাণ উথলে উঠে। ... আমাদের গুপ্ত সমিতির সভ্য ছাড়া আখড়ার পৃষ্ঠপোষক ও অন্য লোক এই উদ্বোধনের ব্যাপারে গূঢ় রহস্য জানতেন না। তারা ভগিনীর ভাব দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছিলেন। ... ভগিনী নিজে তলোয়ার খেলে, মুগুর ভেঁজে, লাঠি ঘুরিয়ে ও অন্যান্য কসরত করে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে দিয়েছিলেন। আর একদিন তিনি স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রমহিলাদের সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দু-একজন স্ত্রীলোককে বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়েছিলেন।''

এইভাবে নিবেদিতা বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং তরুণদের সামনে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাদের সংগঠিত করে বিপ্লবী সমিতিতে যোগ দেওয়ানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের কাছে চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযোগ এবং বৈপ্লবিক কাজকর্মে সহায়তা প্রদান চালিয়ে যেতে গিয়ে একটা পর্বে বেলুড় মঠে স্বামী সারদানন্দ আর স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারলেন স্বদেশী রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রাখলে মঠ ও মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। ১৮ই জুলাই তিনি সোজাসুজি চিঠি লিখে মঠ ও মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। যে চিঠিটি নিবেদিতা লিখেছিলেন তার থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করা যাকঃ

"Dear Swami Brahmananda, Will you accept on behalf of the Order and myself my acknowledgement of your letter received this evening. Painful as the occassion, I can but acquiesce in any measures that are necessary to my complete personal freedom.

I trust, however, that you and other members of the Order will not fail to lay my love and reverence daily at the foot of the ashes of Sri Ramkrishna and my old beloved Guru.

I shall write to the Indian papers and acquiant them as quietly as possible with my changed position.

Yours in all gratitude and good faith,

Nivedita of Ramkrishna

(উৎস ঃ 'নিবেদিতা' - শর্মিলা বসু দত্ত)

আমরা জানি, স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রধানত আধ্যাত্মিক ও মানবিক উদ্দেশ্যে - যেখানে আধ্যাত্মিকতা আর সেবাধর্মই প্রাধান্য পাবে। এ কথাও তিনি জানিয়েছিলেন মিশনের সংগে রাজনীতির কোনো যোগ থাকবে না। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবে যিনি লালিত হয়েছেন, সেই নিবেদিতা ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের ডাক উপেক্ষা করতে পারেননি। তাঁর নিজেরই দেশাত্মবোধ দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষের দেশাত্মবোধের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন। এবং তাঁর ভারতবর্ষের প্রতি দেশাত্মবোধ শুধু বিপ্লব আন্দোলনেই সীমায়িত ছিল না - স্বামীজী তাঁকে যে ভারতপ্রেমে উজ্জীবিত করেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিতার প্রয়াস সেই প্রেমেরই স্ফূরণ। আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁর যে প্রেম তা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁর অপার অন্তরঙ্গ জ্ঞান ও চেতনায় প্রোথিত ছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর নিবেদিতা তাই যাত্রা শুরু করেছিলেন ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে - নাগপুর, মুম্বাই, গিরিগাঁও, ওয়ারধা, অমরাবতী, বরোদা, অমেদাবাদ ঘুরে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। মুম্বাইয়ের একটি বক্তৃতায় নিবেদিতা বললেন -

''আমি নিজেকে কৈবল্য-প্রাপ্ত, বিখ্যাত ও পরমপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দে শিষ্যা - কেবল শিষ্যা নয় - কন্যা বলে মনে করি। অর্থাৎ আমি একজন হিন্দু কুমারিকা, এবং এই ধর্মে আমার নূতন জন্ম হয়েছে বলে আপনাদেরই ছোটবোন। আপনারা মনে প্রাণে আমাকে ছোটবোন মনে করে ভালোবাসবেন, - এই দেশকে আমি আমার দেশ ভেবে নিয়ে এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে এসেছি। অতএব আমাকে ঘৃণা না করে আপনাদের সঙ্গে বারবার মিশবার সুযোগ করে দিন, তাহলেই আমার জন্ম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।'' (উৎস ঃ শর্মিলা বসু দত্ত)

এই পর্বেই বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিবেদিতার দেখা, সে কথা আমরা আগে লিখেছি। ফেরার পথে *দৌলতাবাদ হয়ে অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্র দেখে ২৩শে নভেম্বর কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন নিবেদিতার। যে ভারতবর্ষকে স্বামীজী নিবেদিতাকে দেখাতে চেয়েছিলেন, তারই জাগ্রত আত্মাকে অজন্তা-ইলোরার শিল্প-ঐতিহ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন নিবেদিতা। এরপর ৮ই ডিসেম্বর নিবেদিতার যাত্রা দাক্ষিণাত্যের পথে। মাদ্রাজে এসে একমাস থেকে মাদ্রাজবাসীকে ভারতবোধে উদ্বোধিত করলেন। নিবেদিতা সম্পর্কে বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ভারতবর্ষ তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা দেবে। সে বাণী নিবেদিতার মধ্যে সত্যরূপ নিয়েছিল। মাদ্রাজে একটি*

বিবৃতিতে তিনি লিখেছিলেন - ''... দেশে বহু শক্তিশালী কর্মী জন্মাবে, যারা কাজের জন্যই কাজ করবে, স্বদেশ আর স্বদেশবাসীর সেবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে তৈরী থাকবে। এই স্বদেশের কাছ থেকেই আমরা সব পেয়েছি - আমাদের জীবন, আহার, বন্ধু, পরিজন, শ্রদ্ধা। এই দেশই কি আমাদের প্রকৃত মা নন? তাঁকে কি আবার মহাভারতবর্ষরূপে দেখবার ইচ্ছা আমরা পোষণ করব না?''

(উৎস ঃ তদেব)

(তিন)

বৃটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা নিবেদিতার হৃদয়ে গভীরভাবে বেজেছিল, নিবেদিতার চিঠিপত্র এবং বক্তৃতাগুলি তার প্রমাণ দেয়। চিঠিপত্রে দেখি স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে নিবেদিতার পূর্ণ সমর্থন। ১৯০৩, ২৮শে জানুয়ারী **অ্যালবার্টা** এবং **হোলিস্টারকে** চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন "When will the Motherland rise again - the Gita in one hand and the sword in the other." - ১৯০৪ আগষ্ট জোসেফিন ম্যাকলিউডকে লিখেছেন - ''How long? Oh if the Mother would give me 'strength like Thunderbolt' and words with unspoken menace in them - and weight of utterance."

তরুণ যুবকদের সঙ্গে আলাপের সময় তাদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন নিবেদিতা, তার একটি পরিচয় পাওয়া যায় গবেষক **শংকরীপ্রসাদ বসু**-র গ্রন্থে (লোকমাতা নিবেদিতা) উদ্ধৃত 'বিবেকানন্দ বোডিং হাউস'-এর অন্যতম আবাসিক ছাত্র **প্রমথরঞ্জন নাগের** স্মৃতিচারণায়। ঘরোয়া এই আলাপচারিতায় ধর্ম প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে নিবেদিতা আরো বৃহত্তর প্রসঙ্গে গেলেন - ''But my dear young boys, besides all your conception or knowledge of DHARMA, I shall now tell you something of a higher, nobler and more sacred factor in your lives which I would urge most honestly and emphatically to you all to follow or act as your sublimest and greatest DUTY, the first and foremost obligation.

"You all are required to know your Motherland - your great MOTHER!

"MOTHER BHARATMARSHA!

I would advise you to see Her, go round Her, to know Her people, their religion, culture, literature, language, customs and traditions, in one word their history thoroughly, to meet them and mix with

them initmately often, whenever such an opportunity occurs to love them. Just as a son or a dauther behaves or mixes with his or her mother freely and intimately, so you should love Her, respect Her, serve Her, worship Her with most reverential salutation!

BANDE MATARAM"

প্রমথরঞ্জন তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন বন্দেমাতরম্ কথাটি নিবেদিতা খুব স্পষ্টভাবে সংস্কৃতে উচ্চারণ করেছিলেন। প্রমথরঞ্জন লিখেছেন, ''১৯০৩ সালে একটি ছাত্রাবাসের কক্ষে যে পূত শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল তা অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের মতো। নিবেদিতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে মাতৃমন্ত্র তুলে এনে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন।"

মুম্বাই সফরের পরে নিবেদিতা নাগপুরে আসেন এবং বিচারপতি কোহ্লটকরের বাড়িতে ওঠেন। ৮ থেকে ১১ই অক্টোবর প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে রিপোর্ট অনুযায়ী নিবেদিতার এইসব সভায় বেশ জনসমাগম হতো। *১১ই অক্টোবর নাগপুরের মরিস কলেজে ছাত্রদের একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ করেন। ঐ সভায় উপস্থিত জি.ভি. দেশমুখ ১৯৫৩ সালে এ সম্পর্কে যে স্মৃতিচারণা করেছিলেন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায়, সেখান থেকে দেখা যায় নিবেদিতা কীভাবে সেখানে ছাত্র, যুব-সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।*

বিশেষভাবে ছাত্রদের নিবেদিতা কী বলেছিলেন সেটি দেশমুখের লেখা থেকে শোনা যাক ঃ ''We are having too much of higher education and too many graduates are turned out of the universities, who are completely physical wrecks, unfit to protect themselves, their mothers, or their sisters in time of difficulties. Such weaklings can be of no use to society. The country needs robust and patriotic men instead of persons who serve a foreign government and dominate over their countrymen. They alone can uplift the country. You should feel disgusted to perpetuate the authoritarian rule of a foreign government by serving it.

এইখানে একটা বিষয় আমাদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। একদিকে নিবেদিতা অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন - যিনি একজন চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদের নেতা বলে পরিচিত; অন্যদিকে নিবেদিতা একইসঙ্গে Moderate বা নরমপন্থী নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আলাপচারিতায় নিবিষ্ট হন। মারাঠা নেতা

গোখেলের সঙ্গে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়ে নিবেদিতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এই ভেবে যে একজন মারাঠা নেতা বাংলার এত প্রীতিভাজন এবং একই সঙ্গে শ্রদ্ধার পাত্র তাঁর ধীশক্তি, তাঁর সাহস এবং নিঃস্বার্থ ভাবের জন্য। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গোখেল ছিলেন ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য। কাউন্সিলে গোখেলের বক্তব্য - নিবেদিতার ভাষায় 'manly speech to the Viceroy' - নিবেদিতার অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। গোখেলের নরমপন্থী কোনোসময়ই অরবিন্দ ঘোষ মেনে নিতে পারেননি। আমরা জানি নিবেদিতার চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদী দলের নীতির প্রতি বেশি সমর্থন ছিল। তাই গোখেলের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের কোনো সহযোগ বা বোঝাপড়া না হলেও নিবেদিতা চেষ্টা করেছিলেন গোখেলের মতো একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে কিছুটা হলেও যদি তাঁর নিজের বিপ্লবাত্মক নীতির প্রতি আকৃষ্ট করা যায়। এর প্রমাণ রয়েছে নিবেদিতার কিছু চিঠিতে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গোখেল ইংল্যান্ডে যান। নিবেদিতা চেয়েছিলেন মডারেট গোখেল ইংলণ্ডে positivist রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ১৯০৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর শ্রীমতি হেস্টি-কে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লেখেন - ''This letter is to introduce to you Mr. G. K. Gokhale of Poone - the leading Indian member of Viceroy's Council. Mr. Gokhale is only in England for a few weeks, and I do want him meet all the leading Positivists and especially your friend Mr. Wilson.'' নিবেদিতা চেয়েছিলেন মডারেট গোখেল ইংলণ্ডে বিশিষ্ট ব্রিটিশ সাংবাদিক উইলিয়াম স্টেডের সঙ্গে কথা বলে লর্ড কার্জনের কার্যকলাপ পরিস্কারভাবে জানান এবং কার্জনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলে একটি জনমত গড়ে তুলুন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ উইলিয়ম স্টেড-কে নিবেদিতা লিখলেন - ''Mr. Gokhale is the forthcoming leader of the Congress. He is also the leading Indian Member of the Viceroy and has fought a duel three winters long with Lord Curzon over the educational question. Mr. Gokhale's own achievements as a university graduate are such as to make him an authority of this question, apart from the fact he voiced the opinion of an India that was united to a man ... There is no man so qualified as Mr. Gokhale to expose to you and to world the perfect tissue of lies of which that speech (of Lord Curzon at Shimla on education) consists''

মডারেট গোখেলের একটা সমস্যা ছিল, সেটি হল তাঁর ইংরেজ ভক্তি। ইংলণ্ডে গিয়ে কঠোর প্রতিবাদ না করতে পারেন এ'রকম একটা সম্ভাবনা বোধ হয় নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই মডারেট পন্থী গোখেলকে খানিকটা কঠোরভাবে সচেতন করে দিতে

চেয়েছিলেন নিবেদিতা। সেজন্য গোখেলকে এই কড়া চিঠিটি লিখেছিলেন ঃ "I hope you will not be shut up while you are in England, amongst a few saintly and exquisite persons, but that you will have the chance of judging my people as they really are - often blood thirsty - always money thirsty - degraded by unjust words and rapidly losing hold of the things that were of old the glory of the English home."

(চার)

এরপর আসে স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলন সম্বন্ধে নিবেদিতার আন্তরিক সমর্থনের কথা। ১৯০৬-এর মার্চে The Indian Review পত্রিকায় নিবেদিতা লিখেছেন ঃ "The note of manliness and self-help is sounded throughout the Swadeshi Movement. There is here no begging for help, no clinging for concession... there will yet come a time when in India a man who buys from a foreigner what his own countrymen would by any means supply will be regarded as on level with the killer of cow today. For assuredly, the two offences are morally identical ... It is precisely in a matter like the keeping of the Swadeshi vow that the Indian people especially can find an opportunity to show their true mettle.

কিন্তু দুঃখের কথা, শেষ পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে নিবেদিতা হতাশ হয়েছিলেন, কারণ স্বদেশী আন্দোলনকে একটা সাংগঠনিক রূপ দেওয়া যায়নি - তা অনেকটাই বিক্ষিপ্ত এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। ১৯১০ এর ১৪ই সেপ্টেম্বর স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারে নিবেদিতা তাঁর হতাশা জানিয়েছিলেন S. K. Ratcliff কে -"But for the moment, things grow steadily worse. The people have lost ground In Educational opportunity, what an infinite loss! Then journalism has been crushed. Swadeshi has been shattered. And poverty goes worse and worse ... I am down - hearted - but oh! things are dreadful!!! The proverty makes one ill to look upon - and it is growing. And is there, after all any hope? These people are children. It is really sheep against wolves."

১৯০২ সালে আরো একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে নিবেদিতা তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন এবং এ দেশে বৃট্রিশ প্রশাসন সম্পর্কে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। নিবেদিতার ধারণা হয়েছিল লর্ড কার্জন ভারতীয়দের প্রাপ্য অধিকার এবং মর্যাদা কেড়ে নেবার উপক্রম

করেছেন। নিবেদিতার এ ধারণা অমূলক ছিল না। একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। সেটি হল ১৯০৪ সালের 'Universities Act' । ১৯০২ সালে কার্জন 'Universities Commission' গঠন করেন। এর পিছনে কার্জন মূলত দু'টি জিনিস চেয়েছিলেন - একনম্বর, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা এবং ভারতীয়দের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সংকোচন করা। এমনকী কার্জন একটি কুমন্তব্যও করেছিলেন - যাদের টাকা নেই, তাদের উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহী হওয়ার দরকার কী। সাধারণ ভারতীয়রা উচ্চশিক্ষা পান, এটা কার্জনের কাম্য ছিল না। *আসলে ব্রিটিশ রাজশক্তির কৃপাধন্য দেশীয় রাজন্যবর্গ, সামন্ত প্রভু, ও ধনী পরিবারগুলি একমাত্র এই সুযোগ পাক, মনে হয় এটিই কার্জনের অভিপ্রেত ছিল, এই Universities Commissionএর সুপারিশের বিরুদ্ধে দু'জন প্রতিবাদ জানান - নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথ।*

আমরা জানি ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা বাংলায় আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এই বছর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। সেটি হল ফেব্রুয়ারীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে কার্জনের ভাষণকে কেন্দ্র করে ভয়ানক বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই দুটি ক্ষেত্রেই কার্জনের সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যের বিরুদ্ধে নিবেদিতার প্রতিবাদ চিরস্মরণীয়। ১৯০৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে লর্ড কার্জন রাজ্যবাসীকে প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী বলেন। কার্জনের বক্তব্যের মূল কথা - প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্যের নীতিকথার স্থান অনেক উচ্চ। কার্জনের বক্তব্য একটু দেখা যাক ''Untruthfulness consists in saying or doing anything that gives an erroneous impression either of one's own character or of other people's conduct or the facts and incidents of life. I say that the highest ideal of truth, is to a large extent, a western conception. Undoubtedly, truth took a higher place in the moral codes of the West before it had been similarly honoured in the East.''

নিবেদিতা এই কনভোকেশন উপস্থিত ছিলেন। **প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার** লেখায় পড়ি ঃ ''সভায় উপস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উক্তিতে বিলক্ষণ অপমান বোধ করিলেও কেহ কোনো উত্তর দিলেন না। সভাকক্ষে অখণ্ড নীরবতা দেখা গেল। বক্তৃতান্তে লর্ড কার্জন চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেনেট হলের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া এই অপমানজনক উক্তির আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিবেদিতাও সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং ক্রোধে অপমানে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। অবিলম্বে এই অপমানের সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রয়োজন। অধীর হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, লর্ড কার্জনের 'Problems of the Far East' পুস্তকখানি কাহারো নিকট আছে কিনা। গুরুদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ঐ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি সেই রাত্রেই উত্তর প্রস্তুত করিলেন।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এর পরের ঘটনা বলেছেন - ''ভগিনী নিবেদিতা যে পল্লীতে বাস করিতেন, সেই পল্লীতে অমৃতবাজার পত্রিকার কার্যালয় অবস্থিত। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় লর্ড কার্জনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন লর্ড কার্জন স্বয়ং মিথ্যাসক্ত ও তোষামোদকারী।" কনভোকেশনে কার্জনের বক্তৃতার অংশবিশেষ এবং Problems of the Far East' বইতে কার্জনের লেখার একটি অংশ বিশেষ একই সঙ্গে উল্লেখ করে নিবেদিতা অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য অমৃতবাজারে কার্জনের বক্তৃতা এবং 'Problems of the Far East' বইয়ের ওই অংশ প্রকাশ করে এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, গ্রন্থটির সর্বশেষ সংস্করণ থেকে চালাকি করে ওই অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

কার্জন এবং বৃটিশ প্রশাসনের দমনমূলক মনোভাব নিবেদিতা এর অনেক আগেই ধরতে পেরেছিলেন। ১৯০৪, এপ্রিলে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ''You do not know how terrible the government is becoming. The Thibet expedition, the new stand about Education, the division of Bengal, the official Secrets Bill, the Ancient Monuments - every measure is oppressive and tyrannical, and aimed at the undermining of the faculty for liberty."

(পাঁচ)

এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বেনারসের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। সেটির চমৎকার বর্ণনা পাওয়া পাওয়া যাবে নিবেদিতার উপর লিজেল রেমঁ-র বইয়ে। এই অধিবেশনে নরমপন্থী বা মডারেট নেতা গোখেল ছিলেন সভাপতি। বেনারস কংগ্রেসে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলার স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন। চরমপন্থী নেতাদের ভিতর উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্র থেকে বাল গঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাব থেকে লালা লাজপত রায়। নিবেদিতা এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বাংলা থেকেও মডারেট এবং চরমপন্থীরা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল এবং অন্যান্য চরমপন্থীরা চাইছিলেন কংগ্রেস স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিক। এই নিয়ে মডারেট এবং চরমপন্থীদের ভিতর একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। নরমপন্থী কংগ্রেস নেতা গোখেলের সভাপতির অভিভাষণে এটা বোঝা গেল। আসলে নরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করেছিলেন বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলনকে গ্রহণ করলে তা

বৃটিশ সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং চূড়ান্ত সংগ্রামে পরিণত হবে এবং সমস্ত রকম শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। গোখেলের অভিভাষণে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল - ''বয়কট কথাটার ভিতর একটা প্রতিশোধ ও বিদ্বেষের ভাব রয়েছে। ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, তাতে কংগ্রেস দেশের পক্ষ থেকে বয়কট প্রস্তাব সমর্থন করতে পারে না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরমপন্থীদের চাপের কাছে গোখেল মাথা নত করেছিলেন, তার একটি বড় কারণ গোখেলের উপর নিবেদিতার প্রভাব - এ 'কথা ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীও স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনাও স্মরণীয়। বেনারস কংগ্রেস চলাকালীন সরলা দেবী চৌধুরাণী উপস্থিত হন এবং অনেক প্রতিনিধি দাবি করতে থাকেন তাঁকে মঞ্চে 'বন্দেমাতরম্' গাইতে দেওয়া হোক। গোখেল এই প্রস্তাবে সম্মত হননি কারণ সে সময় বাংলাদেশে 'বন্দেমাতরম্' সংগীত নিষিদ্ধ ছিল। গোখেলের মনে হয়েছিল বেনারস কংগ্রেসে 'বন্দেমাতরম্' গাওয়া হলে ইংরেজ শাসকরা রুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরমপন্থীদের চাপে সরলা দেবীকে গানটির কয়েকটি লাইন গাইতে দেবার অনুমতি দেন গোখেল। বেনারস কংগ্রেসের শেষ পর্বে গোখেলকে ধন্যবাদ জানানোর দায়িত্ব নিবেদিতার উপর পড়েছিল। নিবেদিতার সেই ভাষণ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিবেদিতা বলেছিলেন - ''জাতীয়তার জন্ম ইউরোপেই হয়েছিল। সেই বিরাট ঐতিহ্যকে ইংল্যাণ্ড ভুলে গিয়েছে। ভারতের জনগণকেই এখন উঠে দাঁড়াতে হবে, বাধ্য করতে হবে ইংল্যাণ্ডকে তার পুরনো আদর্শে ফিরে যেতে ।... ভারতের জাতীয়তার স্বপ্ন ভারতের পক্ষে কোনো স্বার্থের স্বপ্ন নয় - এ হল মানবতার স্বপ্ন, যেখানে ভারত বিরাট আদর্শের জননী, যা কিছু মহৎ প্রেমময় এবং বৃহৎ, তারই পালিকা ধাত্রী।''

তা ছাড়া কংগ্রেস সম্পর্কে নিবেদিতার বক্তব্য - তিনি কী আশা করতেন, কংগ্রেসের কাছে, তার উজ্জ্বল পরিচয় ধরা আছে নিবেদিতার 'The Task of the National Movement in India' প্রবন্ধে। নিবেদিতা এই প্রবন্ধে লিখেছিলেন এই সার কথা - ''....the real task of the Congress is that of an educational body - educating its own members in that new mode of thinking and feeling which constitutes a sense of nationality, educating them in the habit of prompt and united action, of political trustiness, of communal open-eyedness; educating itself, finally in the knowledge of a mutual sympathy that embraces every member of the vast household which dwells between the Himalayas and Cap Camorin, between Manipur and the Arabian Sea.

এরপর ১৯০৬ এর কলকাতা কংগ্রেস। বেনারস কংগ্রেসে শ্রীঅরবিন্দ উপস্থিত থাকতে

পারেননি, কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসে চরমপন্থীদের হয়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন, এবং ১৯০৭-এ সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ চরম আকার নিল এবং কংগ্রেস ভেঙ্গে টুকরো হল। এ দুটি কংগ্রেসে নিবেদিতা উপস্থিত থাকতে পারেননি। কংগ্রেসের এই বিভাজন নিবেদিতা মেনে নিতে পারেননি। সুরাট কংগ্রেসে ভাঙ্গনের পর ১৯০৮ সালে Modern Review পত্রিকায় নিবেদিতা লিখলেন - "We dislike the terms 'Moderate and Extremist'. To our thinking there is but one party in Indian politics and that is the Nationalist party .... The differences between the two resultant bodies are mere differences of methods. And these are easily explained. All statesmen have to determine between rival parties and convictions as to which is, in their personal opinion, a survival from the past and which is a prophecy of the future. In the present case, it would be quite impossible, to our thinking, to be in any doubt on this point.

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, যদিও তিনি বিচ্ছিন্নভাবে ইংরেজ হত্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি একটি দীর্ঘস্থায়ী সামরিক প্রস্তুতি নিতে চেয়েছিলেন যাতে করে প্রয়োজন হলে শেষ পর্যন্ত চরম আঘাত হানা যায়। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিপ্লবীদের গোপন কাজকর্মে নিবেদিতার সহায়তা। লিজেল রেমঁ-র বিবরণ অনুযায়ী, মুরারিপুকুরের গোপন আস্তানায় বিপ্লবীরা যে বোমা বানানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন, তার সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ ছিল। রেমঁ লিখেছেন, '' এই সব রসায়ন-রসিকদের গোপনে প্রেসিডেন্সী কলেজ ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে নিবেদিতা দ্বিধা করতেন না। জগদীশ বসু আর প্রফুল্ল রায় ছিলেন সেখানকার অধ্যাপক। দু'জনেরই ল্যাবরেটরিতে সহকারী দরকার হত। অবশ্য দুজনের কেউই নিবেদিতার দুঃসাহসের খবর রাখতেন না। প্রফুল্ল রায়কে ভাবুক স্বভাবের লোক বলেই সবাই জানত, প্রায়ই কোনো কিছুর খেয়াল থাকত না তাঁর। ভালমানুষ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল, গরিবানা চালে দিন কাটিয়ে আয়ের বেশিরভাগটা দান করতেন অভাবগ্রস্তদের। সন্ধ্যায় কার্জন পার্কে বসে বন্ধুদের নিয়ে অনেকক্ষণ গল্প গুজবে কাটাতেন। ফেরবার পথে নিজের ল্যাবরেটরিতে ঘুরে যেতেন এক পাক। জানতেন উৎসাহী কয়েকটি ছাত্র সহকারীদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ল্যাবরেটারিতে কাজ করে। কাউকে কিছু প্রশ্ন করতেন না। একটা ফ্যাসাদ যা দেখতেন, ওরা বড় বেশি অ্যাসিড খরচ করে। ছেলেরা চলে যাবার পর প্রায়ই উনি সব গুছিয়ে রাখতেন, ব্ল্যাকবোর্ডটা ভাল করে মুছে সাফ করতেন। কিন্তু কখনো কোনো মন্তব্যে করতেন না। এজন্য নিবেদিতা যে তাঁর কাছে কত কৃতজ্ঞই ছিলেন।"

নিবেদিতার অন্যান্য জীবনীকারদের লেখায় এই তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু রেমঁ-র দেওয়া এই তথ্য অগ্রাহ্যও করা যায় না, কারণ আয়ার্ল্যাণ্ডে আইরিশ গুপ্ত সংগঠনগুলির সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে বৈপ্লবিক কার্জকমে অভিজ্ঞতা নিবেদিতার ছিল। তা ছাড়া জগদীশচন্দ্র ছিলেন নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁর সাহায্যে দু-একজন তরুণ বিপ্লবীকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো নিবেদিতার পক্ষে খুব শক্ত কাজ ছিল না।

(ছয়)

নিবেদিতা এবং শ্রীঅরবিন্দের আর একটি জায়গায় গভীর মিল ছিল - সেটি হল ঃ এক, ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতি, দর্শনকে পাশ্চাত্যের সামনে তুলে ধরা এবং দুই, ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের দমনপীড়ন, ব্রিটিশ শাসনের কুফল এবং ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা। র‍্যাটক্লিফ এবং উইলিয়াম স্টেডের (Review of Reviews-এর সম্পাদক) আগ্রহে নিবেদিতা লন্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালিখি শুরু করেন। অন্যদিকে পণ্ডিচেরীতে প্রস্থানের পর শ্রীঅরবিন্দ বিখ্যাত কর্মযোগিন পত্রিকায় ভারতবর্ষের শিল্প সংস্কৃতি দর্শন সম্পর্কে যে সব নিবন্ধ লেখেন, পরবর্তীকালে সেগুলি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Foundations of Indian Culture আকারে প্রকাশিত হয়। এর পাশাপাশি নিবেদিতার 'Cradle Tales of Hinduism', 'Footfalls of Indian History' এবং 'The Web of Indian Life' মিলিয়ে পড়লে আমরা ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতির মর্মবাণীটি ছুঁতে পারি। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই নিবেদিতার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'The Master as I Saw Him' একখানি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এখানে শুধু স্বামীজীর কথা নেই, আছে স্বামীজীর দৃষ্টিতে যে ভারতবর্ষ নিবেদিতার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, তারও কথা। বস্তুত স্বামীজীর প্রতি ঋণ শ্রীঅরবিন্দও অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করেছেন।

নিবেদিতা সম্বন্ধে সবচেয়ে স্মরণীয় কথাটি বলেছিলেন কংগ্রেস মডারেটপন্থী নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখেল। ১৯০৭-এর শেষ দিকে সুরাট কংগ্রেসে গোখেলের ভূমিকায় নিবেদিতা খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মত পার্থক্যের পরও নিবেদিতার মৃত্যুর পর স্মরণ সভায় গোখেল যা বলেছিলেন তা কালের কপোল তলে একবিন্দু নয়নের জলের মতো শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে ঃ 'ভগিনী নিবেদিতাকে দশ বৎসরের অধিক কাল জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব অপূর্ব ও চমকপ্রদ, তা এমনই যে, তাঁর সাক্ষাতে এলে মনে হত বুঝি কোনো বিরাট নৈসর্গিক শক্তির সম্মুখীন হয়েছি। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও মননশক্তি, কাব্যময় রচনা প্রতিভা, বিপুল শ্রম-সামর্থ্য, আদর্শ ও বিশ্বাস সুতীব্র আবেগে ধরে রাখার ক্ষমতা, সর্বোপরি যে কোনো বস্তুর আত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করার

যথার্থ বিরাট প্রতিভা - এই সকলই যে তাঁকে যে কোনো দেশের যে কোনো কালের এক অত্যাশ্চর্য নারী করে তুলেছে। এদের সঙ্গে যখন যুক্ত হল সর্বপ্লাবী সীমাহীন ভারতপ্রেম, যে প্রেমের অর্থ ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে প্রাণ ব্যাকুল অনুরক্তি, ভারতের সেবায় পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন এবং ব্যক্তিজীবনে কঠোর অথচ আক্ষেপহীন, আনন্দময় কৃচ্ছ্রসাধনা - তখন ভগিনী নিবেদিতা যে আমাদের কল্পনাকে আলোড়িত করে হৃদয়কে অধিকার করে নেবেন, কিংবা চতুষ্পার্শের মানুষদের উপর সুগভীর, সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করবেন এবং আমরা তাঁকে দেশসেবায় নিয়োজিত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানবগণের অন্যতম বলে গ্রহণ করব তাতে বিস্ময়ের কী আছে?"

"... ভারতের ডাক শুনেছিলেন বলেই - ভারতের সম্মোহনে ধরা দিয়েছিলেন বলেই এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন ভারতে তাঁর হৃদয়ের পূজা নিবেদন করতে,সেই সঙ্গে ভারতের সন্তান-সন্ততিদের পাশে দাঁড়িয়ে সামনে যে বিরাট কর্মভার রয়েছে তার দায়িত্ব নিতে। তাঁর সেই অপরূপ ভারত বরণের মহিমাকে মানব ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।"

আজ ভারতবর্ষে চারিদিকে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা অবনতির অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে। আজ নিবেদিতা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই উচ্চারণ করতেন সেই শেষ কথাটি যা তিনি অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯১১ সালে ইহলোক থেকে প্রয়াণের কিছু আগে - 'The boat is sinking, but I shall see the sunrise."

তথ্যসূত্র ঃ

১) নিবেদিতা ঃ শর্মিলা বসু দত্ত

২) নিবেদিতা ঃ প্রব্রাজিকা মুক্তি প্রাণা

৩) ভগিণী নিবেদিতা ঃ লিজেল রেমঁ

৪) নিবেদিতা লোকমাতা ঃ শঙ্করী প্রসাদ বসু

৫) জ্বলিছে ধ্রুবতারা ঃ রন্তিদেব সেনগুপ্ত

৬) Long journey Home : Barbara Fox

৭) Sri Aurobindo on himself : Sri Aurobindo

৮) Collected letters of Nivedita : Ed. by Sankari Prasad Bose

আমন্ত্রিত রচনা

শিক্ষাব্রতী নিবেদিতা ঃ আজকের প্রাসঙ্গিকতা

ড. চিত্রিতা দত্ত সরকার

" The mother's heart, the hero's will
The sweetness of the southern breeze,
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars, flaming free;
All these be yours, and many more
No ancient soul could dream before -
Be thou to India's future son
The mistress, servant, friend in one." -

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মানস দুহিতার উদ্দেশে লিখে ছিলেন এই আশীর্বাণী, যা সেই রমনীর যেন সমগ্র জীবনের একটি নিখুঁত আলেখ্য, তিনি রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা, শ্রী শ্রী মায়ের আদরের খুকি, আয়ারল্যান্ড -দুহিতা, সমগ্র ভারত ও ভারতবাসীর ভগিনী নিবেদিতা।

১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর মাসে উত্তর অ্যায়ারল্যান্ডের সুবিখ্যাত নোবেল পরিবারে এই মহীয়সীর জন্ম। তাঁর জন্মের আগে মা মেরী ইসাবেল দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন '' প্রভু, যদি নিরাপদে আমার সন্তানের জন্ম হয়, তাহা হইলে তোমার চরণেই আমি তাহাকে সমপর্ণ করিব।" মায়ের মনের এই ইচ্ছেই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছিল। ভারতবর্ষকে ভালোবেসে, এক গভীর ঈশ্বর বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার টানে, স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে, স্থায়ীভাবে এ দেশে চলে আসেন। এই দেশকেই নিজের মাতৃভূমি জ্ঞানে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে ভারত কল্যাণে নিযুক্ত করলেন।

এখন থেকে দেড়শো বছর আগে যিনি জন্মেছিলেন আয়ারল্যান্ডে, ১২২ বছর আগে মহৎ কল্যাণব্রত নিয়ে যিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন, আজকের সময়ের সমাজে, জীবনে শিক্ষায় তিনি কতোটা প্রাসঙ্গিক ?

শ্রী রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের সঙ্গে আজও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। তবে নিছকই কি এই স্মরণ, নাকি আজকের আধুনিক জীবনে তিনি একই রকম ভাবে প্রাসঙ্গিক ?

ভগিনী নিবেদিতার নানাবিধ কর্মযজ্ঞের মধ্যে ছিল ভারতীয় নারীর মুক্তি, তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালানো এবং একজন উন্নত মনের স্বাধীন নারী হিসেবে গড়ে তোলা, যা একই সঙ্গে আধুনিক জীবনমুখী এবং বাস্তবোচিত। আধুনিক যুগের নারীর জীবনে এবং সমাজে নিবেদিতা আজও প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসার আগে স্বামীজির কাছ থেকে একটি পত্র পেয়েছিলেন এবং তারপরই সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তিনি ভারতবর্ষে চলে আসেন, এক মহান ব্রত নিয়ে।

স্বামীজি সেই পত্রে লিখেছিলেন –

আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তাহা এই - মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে। কুসংস্কারের নিগড়ে এই সংসার আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত সে নর বা নারীই হোক - তাকে আমি করুণা করি, আর যে উৎপীড়ক সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র। এই একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না। জগতকে আলোক দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য এবং যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে।

যাঁরা জগতে সর্বাধিক সাহসী, বরেণ্য তাঁহাদিগকে চিরদিন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন আছে।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যঁঙ্গমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। জগতে এখন যা একান্ত প্রএয়াজন তা' হচ্ছে চরিত্র। জগত এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং যাঁরা স্বার্থহীন। সেই প্রেম প্রত্যেকটি বাক্যকে বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী করে তুলবে।

এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত। তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি আছে, আর ধীরে ধীরে আরো অনেক আসবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী এবং তদপেক্ষা জ্বালাময় কর্ম। হে মহাপ্রাণ উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে - তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাহিরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে বড় কি আছে? এর চেয়ে মহত্তর কোন কাজ আছে? আমরা এগিয়ে চলার সাথে সাথেই আনুসঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না।

কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে এবং নিজের কার্যসাধন করে। আমি শুধু বলি - ওঠ। জাগ।

তুমি চিরকাল আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ জানবে।”

গুরুর এই নির্দেশ এবং অনুপ্রেরণায় নিবেদিতা বিভিন্ন উন্নয়ন ও কর্মব্রতে নিজেকে সম্পর্ণ করলেন। নিবেদিতার এই কর্মদ্যোগের মধ্যে তাঁর শিক্ষাব্রতী এবং নারী কল্যাণের রূপটি আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

আজকের সময়েও আমরা মেয়েদের লেখাপড়া, উন্নতি, আত্মমর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য নানা আন্দোলন করি। বহুযুগ আগেও নিবেদিতা সেই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন এবং মেয়েদের স্বাবলম্বী, শিক্ষিত, সচেতন করে গড়ে তুলবার জন্য নারী কল্যাণ ও নারী শিক্ষা ব্রতে নিজেকে মনেপ্রাণে সমর্পণ করলেন। কারণ উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কখনওই স্বাধিকার অর্জন করা যায় না। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে নিবেদিতা কঠোর শৃঙ্খলার জীবন-যাপন আরম্ভ করলেন নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার এই তপস্যাপূত জীবনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, ‘‘শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাসনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমারদেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়া ছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়া ছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল - তিনিও অনেকদিন অর্ধাসন অনশন স্বীকার করিয়াছেন তিনি গলির মধ্যে যে বাড়িতে বাস করিতেন, সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্রা হইয়া রাত কাটিয়েছেন তবুও ডাক্তার বা বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই। এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্ল চিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন - ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা যে ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাঁহার মোহ ছিল না। সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান, তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে।”

আজকের বাগবাজারে ভগিণী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় নিবেদিতার নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের অক্লান্ত প্রয়াসের বিশিষ্ট নিদর্শন হিসেবে বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিকভাবে এই বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন স্বামী বিবেকানন্দ। তবে এই জন্য তিনি নিবেদিতার সাহায্য চেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠার দিন ঠিক করা হল ১৩ নভেম্বর, কালীপুজোর দিন। ঐ দিন স্বামী বিবেকান্দ গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী-সারদানন্দকে নিয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ১৬ নং বোসপাড়া লেনে উপস্থিত হলেন। প্রতিষ্ঠার

পর শ্রী শ্রী মা আশীর্বাদ করলেন, '' মহামায়ার শুভাশিস বিদ্যালয়ের উপর শতধারে বর্ধিত হউক এবং বিদ্যায়তনে যে সকল বালিকা শিক্ষালাভ করিবে তাহারা আদর্শস্থানীয়া হউক।''

অল্প পরিসর গৃহেই কয়েকটি মাত্র ছাত্রী নিয়ে সুরু হল নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়। নিবেদিতার শিক্ষা পদ্ধতিও ছিল অভিনব এবং একই সঙ্গে আধুনিক। শিশু মনের ওপর কখনও তিনি জোর করে কিছু চাপান নি। আজকের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির Play method ঐ যুগে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেকটি বালিকা নিজের নিজের মনোভাব এবং সংস্কার অনুযায়ী খেলার ছলে তাদের অর্ন্তশক্তির প্রকাশ ঘটাক। এখানে প্রথমে নির্দিষ্ট কোন সময় সূচী বা Syllabus থাকত না। আজকে যে কিণ্ডার গার্টেন System শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোগ করা হয়, নিবেদিতা অত আগেও শিশু শিক্ষার জন্য এই কিণ্ডারগার্টেন Method প্রয়োগ করে অত্যন্ত আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দেন। মেয়েরা যেহেতু তখনও অনেকটাই পর্দানসীন সেই কারণে সারাদিনের মধ্যে যেকোন সময় মেয়েরা আসতে পারত। পুতুলগড়া, সূচীশিল্প, তেঁতুলের বীজ দিয়ে গণনা শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক উপাখ্যান শোনা সবই তাদের শিক্ষার অন্তর্গত ছিল। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই এখানে আসার অধিকার ছিল। বর্ণভেদ যে মানুষের মনকে সংকুচিত করে এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। তিনি মায়ের মত যেমন তাঁর ছাত্রীদের ভালোবাসতেন, তেমনি প্রয়োজন মত তাদের দোষ ত্রুটিও সংশোধন করে দিতেন। তিনি জানতেন কতগুলো জটিল কৃত্রিম বাঁধাধরা নিয়ম - কানুনের মধ্যে বা নিছক শাসন দ্বারা প্রকৃত প্রাণশক্তির জাগরণ হয় না। তাদের সহজাত সংস্কারকে সহজভাবে রূপায়িত করাই ছিল নিবেদিতার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁর চেষ্টা ছিল শিক্ষার্থীর অন্তরৈশ্বর্যকে যথাসম্ভব জাগ্রত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যমতো কিছু লেখাপড়া শেখাতেও সচেষ্ট থাকতেন। এমন কি নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের শিখিয়েছিলেন কোন ভিখারিণী ভিক্ষার জন্য যদি দরজায় এসে দাঁড়ায় - তাকে কখনও বঞ্চিত না করতে। আসলে ভিক্ষেটা বড় কথা নয়, তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের মানুষকে সাহায্য করার শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

ভাস্কর্য, চিত্র শিল্প প্রভৃতি ভারতীয় কলাবিদ্যার প্রতি নিবেদিতার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতীয় কল্যাবিদ্যার মূলে আধ্যাত্মিকতার বীজ নিহিত আছে বলে মনে করতেন। মেয়েদের হাতে আঁকা আলপনা, পেন্সিল বা তুলি দিয়ে আঁকা আলেখ্যগুলো নিবেদিতাকে গভীর আনন্দ দিত। কখনও কখনও মেয়েদের তিনি পাথরে বা মাটিতে ছাঁচ কাটাও শেখাতেন। অর্থাৎ শিক্ষা যতো Practical, জীবনমুখী হবে ততোই সেটা আধুনিক শিক্ষা হবে। এছাড়া সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, রাজস্থান কাহিনি, রামায়ণ,

মহাভারতের কথা গল্পছলে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেন, যাতে স্বদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে মাতৃভূমির প্রতিটি জিনিসকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো সম্ভব হয়। কখনও কখনও তিনি মেয়েদের Zoological Garden, Museum, Botanical Garden প্রভৃতি দেখাতে নিয়ে যেতেন এবং Museum এ প্রাচীনযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন দেখিয়ে দেশের অতীত ঐতিহ্যের বিষয়ে সচেতন করতেন।

প্রথম প্রথম সনাতনপন্থী গোঁড়া হিন্দুসমাজ বিদেশী খ্রীষ্টান মহিলার কাছে শিক্ষালাভের জন্য মেয়েদের পাঠাতে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা তাঁর উদার মধুর ব্যবহার ও অসাধারণ শিক্ষাদান কৌশল দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের মন জয় করে নিলেন। ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল।

নিবেদিতার শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করলেই বোঝা যাবে তাঁর শিক্ষাদান ও শিক্ষা-পদ্ধতি কতোখানি আধুনিক ছিল এবং আজকের সময়েও তা কতোখানি প্রাসঙ্গিক। নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন কেবল শুষ্ক পুঁথিগত বিদ্যা ও ঘটনাপুঞ্জ দ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা বলা যায় না। শিক্ষা বলতে বোঝায় জীবন্ত ভাবরাশিকে যা বালক - বালিকাদের মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও ইচ্ছেশক্তি বিকশিত ও পরিমার্জিত করে। শুধু বুদ্ধির উৎকর্ষ, দিয়ে যে শিক্ষালাভ করা যায় তা মানুষকে ধূর্ত বা চতুর করে তোলে। ঐ শিক্ষা কেবল জীবন নির্বাহের পাথেয় সংগ্রহেরই উপায় মাত্র, তাতে অনুকরণ প্রিয় একটি জীব গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু তা মানুষকে যথার্থ মানুষ করেনা।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে সত্যকে লাভ করলে মনুষ্য জীবনকে সরস ও আনন্দময় করে তোলা যায়, সেই সত্যনিষ্ঠা এবং সাবলীল চিন্তাশীলতা আমাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র হলে, তবেই আমাদের হৃদয়-বুদ্ধির দ্বারা মহৎকাজ এবং উচ্চচিন্তা সম্ভব হবে। আত্মত্যাগকেই তিনি শিক্ষার একটি মূল সোপান বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জাতি সর্বসাধারণের মধ্যে থেকে এরকম হৃদয়বান নিঃস্বার্থ প্রেমিক গড়ে তুলতে পারে, সে জাতির উন্নতি অনিবার্য। তারই শিক্ষা সার্থক। তিনি বলেছিলেন যে ব্যক্তি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের শিক্ষা কেবল একটা শুভ কামনা বা কল্পনায় সীমাবদ্ধ না রেখে, তা নিজের একটা মহান্ কর্তব্যরূপে, দায়রূপে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারবে, সেদিনই প্রকৃত শিক্ষাব্রত উদযাপন সম্ভব হবে। তাই নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে জনগণের শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করা সকলের প্রধান কর্তব্য।

নিবেদিতার মতে শিক্ষা কেবল জাতীয়তাবোধ জাগাবে না, তা জাতিগঠন মূলকও হবে। জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র করে শিক্ষা আরম্ভ হলে দেশকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা ও সেবা করা সম্ভব।

তিনি বলেছিলেন যে সত্যকে লাভ করলে আমাদের জীবনকে সরস ও আনন্দময় করে তোলা সম্ভব সেই সত্য নিষ্ঠা ও সাবলীল চিন্তাশীলতা হোক আমাদের শিক্ষার মূল-মন্ত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন, আত্মত্যাগই প্রকৃত বীর হৃদয়ের চিরন্তর সংগীত ও শাশ্বত প্রেরণা। যে জাতি সর্বসাধারণের মধ্যে থেকে এমনি করে হৃদয়বান নিঃস্বার্থ প্রেমিক গড়ে তুলতে পারে সে জাতির উন্নতি অনিবার্য এবং তার শিক্ষাই সার্থক।

শিক্ষা কেবল জাতীয়তাবোধ জাগাবে না, তা জাতিগঠন মূলকও হবে। জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র করে শিক্ষা আরম্ভ হলে দেশকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা সম্ভব। কারণ তিনি বুঝেছিলেন স্বদেশ-প্রীতির ভিত্তিভূমিতে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে না পারলে বা দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শকে শ্রদ্ধা করতে না শিখলে স্বদেশের প্রতি আন্তরিক প্রীতি যেমন জাগবে না, দেশবাসীরও কল্যাণ সাধিত হবে না। বরং জাতীয়তাবোধের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাবে। জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে যখন স্বাভাবিকভাবে অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তার লাভ করবে, অন্তরের দেবতা যখন জাগ্রত হবেন তখন বিশ্বের দিকে হৃদয় স্বতই উন্মুক্ত হয়ে উঠবে। তখন বই পড়িয়ে আন্তর্জাতিকতা শেখাবার আর প্রয়োজন হবে না।

শিক্ষা বিষয়ে নিজের মন বুদ্ধিকে স্বদেশী ভাবধারায় পরিপুষ্ট না করে যেখানে প্রথমেই বিদেশী আদর্শে গড়ে তুলবার চেষ্টা হয় সেখানে অপরিচিতের ঘরে পথে কুড়িয়ে পাওয়া বালকের শিক্ষার মতোই হয় তার জীবন। সেখানে কৃতজ্ঞতা থাকতে পারে কিন্তু সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের প্রেরণার যে একান্ত অভাব তাতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ নিজের জীবন ভিত্তি দৃঢ় হলে বিদেশী শিক্ষা তাদের ভূষণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বিদেশী সভ্যতা সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট ভাব সম্পদ গ্রহণ করে মানুষ তখন উদার মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

দেশের সার্বভৌম আদর্শ, ধর্ম ও দর্শন যা আমাদের সমাজশরীর গঠনে অফুরন্ত উপাদান, তার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়ার ফলেই মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবন একটা নিম্নস্তরে চলে যায়।

স্ত্রী শিক্ষা - সম্বন্ধেও নিবেদিতার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শেরই অনুরূপ। ভারতের নারী জাতির অজ্ঞতা ও দুর্বলতা দর্শনে নিবেদিতা ব্যথিত হয়ে ছিলেন। তিনি মনে প্রাণে অনুভব করেছিলেন যে একটা জাতিকে যদি বাঁচতে হয় তবে স্ত্রী ও পুরুষের সমবেত শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যেই তা সম্ভব। ক্ষুব্ধ চিত্তে তিনি বলেছিলেন, ''Here in India the woman of the future haunts us. Her beauty rises on our vision perpetually. Her voice cries out on us. Until we throw wide the portals of our life and go out and take her by hand to bring her in, the Motherland stands veiled and ineffective with eyes lost in set

patience on the Earth. Her sanctity is to-day full of shadows. But when the womenhood of India can perform the great arati of nationality that temple shall be all light, nay the dawn verily shall be near at hand. " - অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমগ্ন বিধিনিষেধের নির্মম আঘাতে জর্জরিত যে মাতৃজাতি যুগ - যুগান্তর ধরে মৃতকল্প হয়ে পড়ে আছে, সেখানে প্রঅএণর স্পন্দন ক্ষীণ ও স্তব্ধ হয়ে গেছে, সেই মাতৃ জাতির প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে ভারতমাতার রূদ্ধদার উন্মুক্ত হবে না। লাঞ্চনা - মলিন নারী জাতিকে প্রকৃত - শিক্ষায় শিক্ষিত করে যেদিন তাকে গৌরবের সঙ্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে সেদিনই ভারতমাতার অজ্ঞান - অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হবে। এইভাবে নিবেদিতা একটি অসাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন সেই শিক্ষা গ্রহণ করলে, শিক্ষার্থী একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারবে, আর যে শিক্ষা কোন শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ করে তুলতে পারে, তার চেয়ে বড় আধুনিক শিক্ষা কি হতে পারে?

শিক্ষাব্রতী নিবেদিতা তাই শুধু নিজের সময়ে নয় আজকের সময়েও গ্রহণীয় এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র ঃ

১) নিবেদিতা ও সমকালীন ভারতবর্ষ - ড. শঙ্করী প্রসাদ বসু

২) ভগিনী নিবেদিতা; স্বামী তেজসানন্দ।

Sister Nivedita in the Reminiscence of Saralabala Sarkar

Dr. Jayashree Sarkar

Abstract :

The present paper is an effort, not a critical approach, of an individual understanding of Sister Nivedita, her vision of cultural nationalism, in the reminiscence of her near-contemporary, Saralabala Sarkar. Her close proximity to Nivedita provides her readers first-hand details of Nivedita's vision of India, her mission to perpetuate her preceptor's philosophy in the socio-cultural milieu of late 19th and early decade of the 20th centuries India, especially Bengal. Since her first meeting with Nivedita, the relation culminated into an effective bond thus leaving an everlasting imprint on Saralabala's mind.

Saralabala Sarkar (b. 1875) was the granddaughter of Rasasundari Devi, whose "Aamaar Jeevan" initiates a genre of autobiographical writings in Bengali; the book very probably the first full – scale autobiography in Bengali literature. Saralabala's father, Kishorilal was an established lawyer at Calcutta High Court and 'Tagore Law Professor' in Calcutta University. Her early education and initiation into nationalist ' Swadeshi ideals was through her mother, Leelavati who hailed from the Ghosh family of Amritabazar Patrika publications.

Growing in a swadeshi environment, she internalized the values which were further well – defined by the influence of her maternal uncles and brother, Sarasilal. The spirit was further strengthened by Nivedita's (b. 1867) infusion of her vision of "Mother India" and love for the motherland. Her daughter, Nirjharini (b. 1894), a student of

Nivedita Girl's School, was married to Prafulla Kumar Sarkar, founder - editor of Anandabazar Patrika. Saralabala was a renowned poet, a tireless crusader of the oppressed and down – trodden masses, especially women, an intense empathizer of revolutionary freedom fighters simultaneously an active participant in Gandhian nationalist programme.

Just a few days after the death of Nivedita, Saralabala composed a biography 'Nivedita Jeevan Charit' the first of its kind. Swami Saradananda wrote the introduction. It was published by Brahmachari Ganendra Nath on June 1912.

To Saralabala the name 'Nivedita' found its right meaning in Nivedita – a determind, conscientious personality but self-effacing in identifying herself with the miseries of oppressed, voiceless millions overriding her foreign nationality. She used to feel that she had no other identity than being a member of the order of Sri Sri Ramakrishna. So she used to sign as 'Nivedita of Ramakrishna Vivekananda'. She had extreme reverence for Sri Sri Ramakrishna and her preceptor Swami Vivekananda In the classroom, she told her students that as she regarded Sri Sri Ramkrishna as 'Jagat Guru' who belonged to the world, so the world map should be put below the guru's picture. But to mother Sree Sree Ma, she was like a little girl. She frequently visited Sree Sree Ma in Baghbazar. On the auspicious day of Kalipuja on 12th November 1902, amidst sanyasis and students Sree Sree Ma performed rituals for establishing Nivedita Girl's School at 17 Bose para Lane. It was a source of divine inspiration for Nivedita. Nivedita, could not imagine anything greater than the blessings of Sree Sree Ma for her students. From the memoir of Prabrajika Bharatiprana of Sri Saradamath, Nivedita recited a poem composed by Saralabala on the auspicious day when Sree Sree Ma visited her school.

Saralabala had a burning desire to meet Nivedita. Her wish was fulfilled when she met Nivedita and Sister Christiana, at the Amrita Bazaar Patrika office. Nivedita was introduced to Saralabala by Sisir

Kumar Ghosh in such words that Nivedita had renounced everything at the feet of God to serve mankind. She was the divine consort of Lord Krishna. Saralabala and other women were introduced to Nivedita as women for whose welfare she had sacrificed everything. The union of the soul that grew continued steadfastly even after Nivedita left this mortal world in 1911.

Vivekananda's urge of establishing a school for imparting right education found its true expression in Nivedita's school at Bosepara. Lane. Saralabala perceived that this vision of education was also reflected in Nivedita's 'The Web of Indian Life' and 'The Master As I Saw Him."

To Nivedita, education should be based upon love for the country and sacrifice. Education should have a responsibility of creating a successful consciousness about one's own country within oneself. This was nothing new but a legacy which had been passed through generations. Saralabala had noticed that Nivedita designed her syllabi in that fashion. Nivedita had taught her students how to view everything in such ideals. Saralabala opined that mere possession of eyes did not ensure the proper way to observe things. In one's own country, people were continuing an unfruitful existence, oblivious of their own heritage and past glory. Nivedita through her lectures could bring out a lively picture of how a person's existence could become meaningful through the love of one's own country. Valorisation was there especially of the Rajput historical characters; Queen Padmini performed the Jahar ritual (self-immolation). But that was, Nivedita felt, was necessary to create an interest on past events. Her happiness knew no bounds when her students could answer correctly regarding questions about their country. Otherwise she used to feel sorry by uttering how they could be so indifferent about their country. She hailed such mythological characters like Gandhari, Sita, Savitri, Damayanti as personifying truth and sacrifice and regarded them as yardsticks of Indian ideals of womanhood.

From little girls to young married women, family mistress as well as widows, education was imparted according to their wishes. Language, mathematics, sewing as well as art and crafts were included in the curricula. Senior girls were often entrusted with the responsibility of teaching junior girls. Some young dedicated widows offered their service. Saralabala appreciated an unmarried woman Sudhira Devi whose motherly affection and thorough involvement made the school running properly; but her position was honorary. What appealed to Saralabala was the method adopted in teaching mathematical calculations – made easy through indigenous ways. As such, the subject turned out to be a matter of love for the students.

Nivedita believed that the seeds of Indian spiritualism and nationalism lay within every branch of Indian art form. With utmost care, she used to preserve paintings by her students on “Piri” (flat wooden low sitting stool on the floor), embroidery on cloth, paintings on paper, earthen plates, threadwork, earthen dolls. She used to take part with her students in making moulds out of stone and dried earth. She was delighted when art critic Kumaraswami appreciated one of the drawings of her student. Here teaching method and curricula in the school ware not conventional, While visiting Indian Museum with her students, she was totally moved at the Buddhist gallery and narrated her students of the past glories.

Long before Mahatma Gandhi's launching of 'charkha' spinning, Nivedita introduced the programme in her school, around 1907/1908; training to be imparted under the instruction of an elderly lady 'Charkha ma’. This was not something novel. Earlier in every household in Bengal, women after finishing their domestic chores used to spin, even at night. Sometimes the yarn was coarse, but cloth, wrappers, towels, ceremonial threads were woven out of them. Before the advent of machine made products, Bengals cottage industry was the prime source of sustenance for spinners, weavers, artisans, blacksmiths, potters and even farmers. As such

Nivedita was very much interested in reviving charkha. She found that the women of Eastern Bengal were more interested and proficient in spinning than their western counterparts. Nivedita felt that the revival of cottage industries would pave the way for nationalism along with added advantage of doing away with indolence and luxury while creating an opportunity for mental upliftment and increase of national property. To substantiate her views, she used to cite examples from ancient Indian literary works.

Nivedita was pained at the sight of India under British rule. When Ashwini Kumar Dutta and some other freedom fighters were released, she was very happy. She decorated her school premises in a traditional welcoming manner. Her whole expression reflected her mood. Nivedita identified four trends of ideals, prevalent in the then society initiated by social reformers, political activists, religious revivalists as well as those who were perturbed by economic miseries of the country. Whatever be the guiding principle, Nivedita felt that prime importance should be given on the unity of all communities which should be the basis of Indian nationalism. The revival of nationalist ideal would help infuse a new life – force among the youths and through them the heart of every Indian.

''সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি অথবা ধর্মনীতি যেদিক দিয়াই হউক না কেন, যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে ভারতের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা পরোক্ষভাবে এই জাতীয়তাবোধকেই জাগ্রত করিয়া তুলিবার সাধনা করিতেছেন।''

Ramananda Chattopadhyay of The Modern Review and Prabasi remarked in a lecture in the memory of Nivedita that Nivedita's feelings about India had made Indians rethink that though being Indians, how less interested they were about their own motherland. He recalled how Nivedita once expressed her admiration and respect for the indegenous method adopted for making 'Amsattva' (sun-dried mango juice) and 'Pataligur' (molasses) by rural folks of Bengal, through generations, devoid of any institutional training. While in the West, preservation of fruits in vacuum-sealed bottles

was done in factories. In the daily household chores of rural women of Bengal such as in the use of 'dhenki' (husking pedal), she could locate the very heart of this secred land.

Being a woman, Saralabala had remembered Nivedita saying that reawakening of India would depend on the unfolding and proper manifestation of Indian women's traditional characteristics. Such a belief was so strong in Nivedita, that when she established her school at the opening of the 20th century, she gave this belief optimal importance.

The society was a witness of Nivedita's devotion in other areas too. When plague turned to an epidemic at Calcutta, she used to nurse the diseased especially in the slums, wholeheatedly and took every care that proper sanitation was maintained, keeping aside the warnings that she could have been affected. Actually Nivedita knew that India, believed in that India and dreamt of that India which had exhibited indomitable courage and for whom sacrifice was affable. Thus Saralabala contemplated and uttered, ''নিবেদিতা ভালবাসিয়া ভারতবর্ষকে আত্মসমর্পণ করিয়া ছিলেন কেবলমাত্র কর্তব্য বোধে করেন নাই।''

Saralabala had a richly blessed life of eighty six years, enriched by her association with Nivedita among others. She expressed her feelings in Girish Chandra Memorial Lecture in 1953 at Calcutta University - ''দেখে মোহিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি ... এক বিদেশিনী আমাদের যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তা যদি আমরা প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে আমাদের দেশের চেহারাটাই বদলে যেত।''

Bibliographic Essay

1. Ray, Sushil, "Sree Saralabala Sarkar", **Smaraniya** Bhadra 1365 BE.
2. Bishi, Pramathanath, "Yugcharitra O Saralabala Sarkar", **Desh**, 21st Pous 1368 B.E.
3. Chakrabarti, Nirendranath, "Sarala, Sahasini", **Anandabazar**

Patrika, 23rd Agrahayan 1382 BE.

4. Ghosh, Baridbaran, "Shatavarshiki Smarane : Saralabala Sarkar", **Sahityik Barshapanji**, Ashar 1383 BE
5. Deb, Chitra, "Introduction", **Saralabala Rachana Sangraha** Vol. I, Kolkata, 1989.
6. Sarkar, Saralabala, **Nivedita Jeevan Charit**, Calcutta, 1912.
7. Ibid,, "Nivedita Prasanga", **Anandabazar Patrika**, 6th Magh, 1335 B.E.
8. Ibid, "Nivedita Vidyalaya O Tahar Adarsha", **Anandabazar Patrika**, Annual Dol No, 10th Chaitra, 1335 B.E.
9. Ibid., "Nivedita Smarane", **Desh**, 7th Bhadra, 1359 B.E.
10. Ibid., "Nivedita O Jatiyatabad", **Desh**, 18th Ashar1367 B.E.
11. Ibid., Kutirshilpa O Niveditar Bhavatvarsha," **Desh**, Sharadiya 1357 B.E
12. Ibid., "Belur Math Sthapaner Par", **Desh**, 31st Bhadra, 1362 B.E.
13. Ibid., "Ramakrishna Missioner Naam O Udeshya, **Desh,** 28th Ashwin 1362 B.E.
14. Sarkar, Nirjharini, **Rachana – Sangraha**, Calcutta, 1991.

PART - II

সমর সেনের কবিতার আঙ্গিক

ড. মমতাজ বেগম

বিষয় চুম্বক ঃ কবি সমর সেনের কবিতায় আঙ্গিকের আলোচনাই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য। রিয়ালিটি বা বাস্তবতার কবি হিসাবেই সমর সেনের মূল পরিচিতি। তাঁর কাব্যে স্বপ্নময়তাকে দূরে সরিয়ে রেখে জীবনের কঠিন বাস্তবকে তুলে ধরেছেন কবি। আর এটা করতে গিয়ে বিচিত্র আঙ্গিকের সাহায্য নিয়েছেন তিনি। অনায়াস দক্ষতায় কাব্যশরীরে তৎসম, আঞ্চলিক, বিদেশী শব্দকে মিশিয়ে দিয়েছেন; আবার একই সাথে রবীন্দ্র কাব্য থেকে শব্দ চয়ন করে প্রয়োগ করেছেন তাঁর কবিতার বাস্তব চিত্রকল্পে; তাছাড়া উপমা ও অলংকারের বিচিত্র প্রয়োগে নাগরিক সভ্যতার ছবি এঁকেছেন। তাঁর কবিতার আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের সাথে মিশে গিয়েছে মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী অস্তিত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং এক্ষেত্রে তিনি নিজেকেও রেহাই দেন নি।

...

'আধুনিক বাংলা কবিতায় নিজেই একটা যুগের প্রবর্তন করেছিলেন সমর সেন। তাঁর কবিতা এতই অভিনব এক গদ্যছন্দে লেখা যে তার উৎস খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। কবিতার বিষয় নগর, নগর জীবনের ক্লান্তি, বিকার, বিক্ষোভ সামাজিক বিরোধ আর শ্রেণীসংঘর্ষ। নগর জীবনের সমগ্র সুরটি যেন ধরা পড়েছে এই সব কবিতায়।'[১]

১৯৪০এর সময়টা যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিশপ্ততায় কালিমালিপ্ত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গ্রাসে কম্পমান সেই সময়েই কবিতা লিখেছেন সমর সেন। নগর জীবনের বাস্তবতাকে এবং জীবনের নানা দ্বন্দ্বময়তাকে অবলম্বন করে বিষয় ও ভাবের উপর তিনি নির্মাণ করলেন এক সুসংহত নির্মেদ আঙ্গিক, নিজের কবিতা সম্পর্কে সমর সেন নিজেই বলেছেন - 'রিয়ালিটির থেকে নিস্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্বল ভঙ্গি, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীকস্বর্গ।'[২]

রিয়ালিটিই ছিল সমর সেনের কবিতার মূল আকর স্থল। কবিতার জগতে পদার্পন করতে গিয়ে সমর সেন নিজেই বলেছেন

'তখন যৌবনের নানা অভিজ্ঞতার ফলে কবিত্বভাব প্রখর হয়েছে।'[৩]

প্রথম যৌবনে নর-নারীর প্রেমঘটিত বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর কবি যুগের হতাশা, বিষাদময়তার সাথে মিশিয়ে দিলেন প্রেমের ব্যর্থতাকে। অজস্র প্রশ্ন ও হতাশার অন্ধকারে আবেগী প্রেম সর্বদা কম্পমান -

'স্তব্ধরাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও ?
আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার,
বিশাল অন্ধকারে শুধু একটি তারা কাঁপে
হাওয়ায় কাঁপে শুধু একটি তারা।
কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধরাত্রে
আমাকে একলা ফেলে ?'

সমর সেনের প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে সুমিতা চক্রবর্ত্তী বলেছেন - 'তাঁর (সমর সেনের) প্রেমের কবিতা প্রায়ই বিরহের, অপ্রাপ্তির, কষ্টের, ভালোবাসার মনোরমতা ও সমারোহ, ব্যাকুলতা ও ধন্যতাবোধ নেই সেখানে। প্রেমের বিদায় চিহ্ন ক্ষতময়। সেখানে শূণ্যতা, নৈঃশব্দ, অন্ধকার। সেখানে অস্থিরতা, বিনিদ্রা, ক্লান্তি।'[৪] এই কারনেই সমর সেনের কবিতার আঙ্গিকে, যতি চিহ্নের ব্যবহারে নতুনত্ব দেখা দিয়েছে। এক গভীর অধিকারবোধ ও পুরুষ শাসনের চোখরাঙানি প্রতিটি শব্দের মধ্যে অনুরনিত হয়েছে।

গদ্যছন্দের সুঠাম ব্যবহারে এবং চরণের মধ্যমিলে সমর সেনের কবিতা নতুন রূপ লাভ করেছে ঃ-

'পথে আজ লোক নেই, জবাবী হামলা হল শুরু।
কারাগার অবারিতদ্বার, গ্রামে গ্রামে বিপর্যয়।
রাস্তায় নিরস্ত্র লোক হৃৎপিন্ডে আহত, সন্ধ্যা রক্তক্ষরা।
মাঝে মাঝে বিচলিত অন্ধকারে প্রহরীর ডাক
রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙে।'(ভ্রান্তি - সমর সেন)

কবিতার ভাষাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন কবি। যেমন 'জবাবী হাম্‌লা' 'নিরস্ত্র লোক' প্রভৃতি ভাষার অনায়াস ব্যবহারে তিনি সর্বদাই অকুণ্ঠিত। মূলত ভাষার ক্ষেত্রে কয়েকটি দিককে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন - আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করেছেন -

'তোমার ক্লান্তি উরুতে একদিন এসেছিলো কামনার বিশাল ইশারা।' (ঘরে-বাইরে)

এছাড়াও ট্যাঁক, বুলি, কুঁজ, হোঁচট, খাপছাড়া, লপেটা, জয়াশা প্রভৃতি শব্দের অনায়াস ব্যবহার রয়েছে। শুধু মাত্র বিদেশী বা ইংরেজী শব্দকে ব্যঞ্জনাময় করে ব্যবহার করেছেন। যেমন

'ম্লান হয়ে এল রুমালে
ইভিনিং ইন প্যারিসের গন্ধ
হে শহর হে ধূসর শহর।' (স্বর্গ হতে বিদায়)

এই কবিতায় অসংখ্য তৎসম শব্দের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার রয়েছে

'কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান'
'লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো'
'নিস্ফল দিন কাটে ক্ষয়রুগীর কামার্ত প্রার্থনায়'(একটি বুদ্ধিজীবী)

অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন শব্দের সঙ্গে শব্দের ঘটকালিতে। যেমন উপমা অলংকারের প্রয়োগ ঘটেছে বিভিন্ন কবিতার পংক্তিতে -

ক) 'মহানগরীতে এল বিবর্ণদিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি'
খ) 'অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি।'(একটি বুদ্ধিজীবী)
গ) 'মধ্য রাত্রে ঘুমের মতো তোমার কালো চুল'(চার অধ্যায়)

উৎপ্রেক্ষা অলংকারের প্রয়োগ দেখতে পাই -

ক) 'অনুর্বর বালুর উপরে
কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান'(প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা)
খ) 'দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে'(প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা)
গ) 'রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম'(বাচ্যোৎপ্রেক্ষা)

অলংকারকে কাব্যের শোভা বাড়াতে কম-বেশি প্রায় সকল কবিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অলংকারকে শব্দের রক্ত মেদ-মজ্জার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ভাবের দ্যোতনাকে আরও যুগোপযোগী করে, বাস্তবানুগ করে ব্যবহার করেছেন কবি সমর সেন। আবার গদ্যছন্দের মধ্যে দিয়ে নাগরিক জীবনের নগ্ন বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন কবি। যেমন -

'মহিষবর্ণ জগদ্দল মেঘে
দিগন্ত রুদ্ধ করে বৈশাখের এ-দিন
শহরের প্রান্তে'

এই নাগরিক বিতৃষ্ণার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে -

'রাত্রির অবিশ্রাম, অশান্ত বিষন্নতা'(ইতিহাস)

'সে চোখে নেই নীলার আভাস, নেই সমুদ্রের গভীরতা
শুধু কিসের ক্ষুর্ধাত দীপ্তি, কঠিন ইশারা
কিসের হিংস্র হাহাকার সে চোখে।'(নাগরিক)

অথবা

'চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষন্ন মুখে
উর্বর মেয়েরা আসে।'(উর্বশী)

এমন অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে চিত্রকল্পের আলোকময় ঝলসানির রূপকে। পাঠকের সামনে যেন কল্পনার ছবি নয় বাস্তবটাই ধরা পড়ে যায়।

সমর সেনের কবিতায় আর এক নতুন রূপ পাওয়া যায় তা হল রবীন্দ্র কবিতার 'নাম' কাব্যভাবনার নবরূপায়ণ। যেমন - 'স্বর্গ' হতে বিদায়', 'চার অধ্যায়', 'চিত্রাঙ্গদা' 'মেঘদূত' প্রভৃতি নামের মধ্যে এবং কাব্যভাবনা থেকে নতুন ভাববৃত্ত এবং আঙ্গিক অন্বেষণ করেছেন। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের লাইন ব্যবহার করে আধুনিকতার কুটিল রূপ উদ্ঘাটন করেছেন। যেমন

'কালের যাত্রাধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর, হে ধূসর শহর।
লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচ
দশটাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী' (স্বর্গ হতে বিদায়)

উর্বশীর মিথ ভাবনা, 'স্বর্গ হতে বিদায়ের' বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন প্রেম ভাবনা আধুনিক নারীর বিক্রীত রাপের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

'জমাট অন্ধকারে কর্দমাক্ত স্তব্ধতায়
দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল চলে আপন পথে
পশ্চিমে চটকল, গঙ্গা, মধ্যে সুপ্ত শান্ত প্রাসাদে
বর্ধিষ্ণু মেদে নিদ্রারত কুবেরদুলাল
আরো আগে বিস্তীর্ণ মাঠ, ঘনিষ্ঠ সবুজ' (শহরে)

এ অংশ পাঠ করলে শহর কলকাতা ও পাশ্ববর্তী এলাকার সুস্পষ্ট ছবিটা বুঝে নিতে কষ্ট না।

চিত্রকল্প অঙ্কনের ক্ষেত্রেও সমর সেন সংশয় বা ক্লান্তির বারবার স্বগতোক্তি করেছেন। বিদ্রুপ, ব্যঙ্গ, শ্লেষ ব্যবহারে শহর কলকাতার স্বরূপকে তুলে ধরেছেন প্রীতিহীন প্রগল্‌ভতায়। কোথাও কোন শিথিল শব্দের ব্যবহার নেই। তাঁর কবিতার চিত্রকল্প সম্বন্ধে হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-'চিত্রকল্প যেন আলোকচিত্রের ফ্ল্যাশগানের ঝলসানি'[৫] অর্থাৎ সমর সেনের কবিতা পড়তে পড়তে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। নিজের শ্রেণী পরিচয় সম্পর্কে তিনি খুবই বিতশ্রদ্ধ ছিলেন এই ক্লান্তিকর, বিষন্ন শহরের তিনিও একজন বাসিন্দা। অরুণ মিত্র এপ্রসঙ্গে বলেছেন-

'নিজের শ্রেণী পরিচয় তাঁকে বিক্ষুব্ধ করেছিলো বারবার। শহুরে মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী অন্তঃসারশূণ্য চরিত্র তাঁর অশ্রদ্ধা জাগায় প্রথম থেকেই এবং এই শ্রেণীর একজন বলে তিনি নিজেকেও রেহাই দেননি কখনো। এই বিতৃষ্ণা তাঁর স্মরণকে বিচলিত করেছে জীবনের শেষ পর্যন্ত।'[৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘদূত' প্রবন্ধে দুটি মানুষের অতল গভীর বিচ্ছিন্নতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবনাক্ত সমুদ্র।[৭] এই বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গবোধ শহুরে কলকাতার মানুষকে গ্রাস করে নিয়েছে, সমর সেনের কবিতায় তারই মুর্চ্ছনা দেখি-

'কঙ্কাল গাছ হাত ছানি দেয়
প্রখর রৌদ্রে
মরুভূমি আমাদের ঘেরে।'(শবযাত্রা)

'একটি একলা বট খাপছাড়া ছায়া দেয়
প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ় বট, বহুকাল মাখে নি সবুজ কল্প।'

'সবুজ' প্রাণের প্রতীক, যৌবনের প্রতীক। পুরনো কঙ্কালসার, কুসংস্কারগ্রস্থ ধ্যান ধারনাকে প্রলেপ দিয়ে কাজ চালাচ্ছি আমরা। এক বুক মরুভুমির ব্যাকুলতা নিয়ে আধুনিক মানুষের পথচলা। ধৃতরাষ্ট্রের মত আমরা অন্ধ, পুরুর মত আমরা জরাগ্রস্থ হয়ে দন্তহীন বিলোপ মাড়িতে যৌবনকে বাজি রেখে এগিয়ে চলেছি এক ভয়ঙ্কর মিথ্যার দিকে। সেখানে কোন সান্ত্বনা নেই, পালাবার কোন পথ নেই। অন্যান্য কবিদের মত মিথ্যে আশ্বাসকে বুকে চেপে ধরেননি কবি সমর সেন বরং কঠিন সত্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। ভাবের সঙ্গে আঙ্গিকের এমন গভীর মেলবন্ধন খুব কমই চোখে পড়ে বাংলা সাহিত্যে। এ প্রসঙ্গে সমর সেনের সমসাময়িক কিছু কবির কথা উল্লেখ করা যাক।

সাহিত্যের বিষয় নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয় রসরূপের আঙ্গিকে। আমরা জানি 'Style is

the man'. প্রত্যেক কবি একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র তার Style বা আঙ্গিকের গুণে। জীবনানন্দের কবিতার জগৎ গড়ে উঠেছে প্রকৃতি, সমাজ, প্রেম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সময়চেতনার সমন্বয়ে এক অগতানুগতিক আঙ্গিকে। তাঁর শৈলীভাবনা হল প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞানের মিলিত রূপ।

সুধীন্দ্রনাথের আঙ্গিক অনেকটা মধুসূদনের মতো। শব্দভাবনায় কাঠিণ্যেই ছিল তাঁর কাছে গ্রহণীয়। শব্দের ধ্বনি, চিত্রের উৎকর্ষ এনেছেন দুরুহতার মধ্যে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা প্রতীকধর্মিতায় উজ্জ্বল। বিষ্ণু দে কবিতার মধ্যে এনেছেন মিথ ও প্রতীকিভাবনাকে বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে। সমর সেন নগর সভ্যতার ক্লান্তিতে, হতাশায় যেমন আটকে থাকেননি তেমনি আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও কোন বাঁধাধরা ছককে মেনে নেননি। ভাবের যথাযথতার জন্য যেমন রূপকল্প প্রয়োজন তাকে অনায়াসে, দ্বিধাহীন চিত্তে ব্যবহার করেছেন কবিতার শরীরে। তাই নির্দিষ্ট একটি কথার ইশারায় তার আঙ্গিককে মূল্যায়ণ করা সম্ভব নয়।

আসক্তিমুক্ত এই কবি সম্পর্কে অশোক রুদ্র যে কথা বলেছেন সে কথা দিয়েই আমার আলোচনার ইতি টানবো -

'কবির কবিপ্রতিভা, অধ্যাপকের বিদ্যা, বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধি, নারীর নারীত্ব - সবকিছুই দাম ধার্য করা হয়ে গিয়েছে, সকলেই কোনও না কোনও পণ্যের বিক্রেতা। সকলেই উচ্চতম মূল্যে নিজ সত্তাস্বরূপ পণ্যকে বিক্রি করার জন্য বাজারে হাজির। ব্যাতিক্রম সমর সেন। সমর সেনকে কেউ কিনতে পারল না। সমর সেনের কেউ মূল্য ধার্য করতে পারল না। এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা সম্প্রতিকালের বাঙালির ইতিহাসে আর কিছু ঘটেছে বলে জানা নেই।'[৮]

উল্লেখপঞ্জী

১) সমর সেনের কবিতা, প্রচ্ছদাংশ, সিগনেট প্রেস, কলি - ২৩
২) সমর সেন - কবিতা পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৪৫ পৃ - ২৭
৩) 'সমর সেন ঃ বাংলা কবিতা' - 'কবিতা' বিশেষ সংখ্যা, বৈশাখ - ১৩৪৫
৪) আধুনিক বাংলা কবিতার রূপা - মনোজ মুখোপাধ্যায়, বামা পুস্তকালয় পৃ - ২৭
৫) কবিতা নিয়ে - হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় - বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ পৃ-৭৩
৬) অরুণ মিত্র ১৯৮৮, কবি সমর সেন, অনুষ্টুপ বিশেষ সংখ্যা পৃ-১৩
৭) সংকলন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প--৮৪
৮) অনুষ্টুপ, সমর সেন বিশেষ সংখ্যা পৃ-৪৯ (সম্পাদক পুলক রায়)

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'ঃ
'অন্ধকারের স্বামী' কিংবা 'প্রাণের ঠাকুর'

প্রীতম চক্রবর্ত্তী

[বিষয় চুম্বক ঃ রবীন্দ্রনাটকে রাজার আবির্ভাব ঘটেছে বারে বারে, বিচিত্রের দূত হিসাবে। 'রাজা' নাটকে বা তার 'অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ'-এ রাজার অবস্থান ছিল অন্ধকারে। কিন্তু সেখান থেকেই 'উৎসারিত আলো'কে খুঁজে নিতে নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির যাত্রা। এ নাটকের দুই নারী, - রানী সুদর্শনা ও দাসী সুরঙ্গমাও খুঁজে ফিরেছিল রাজাকে - অন্তরে ও বাইরে সম্পূর্ণ করে রাজাকে গ্রহণ করার জন্যই সমগ্র নাটক জুড়ে তাদের কৃচ্ছ্রসাধন। তাদের সেই সাধনার প্রত্যেকটি স্তরকেই রবীন্দ্রনাথ মেলে ধরেছেন এই নাটকের প্রতিটি পর্ব-পর্বান্তরে। অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাস, ধ্বংস থেকে নিষ্ঠা, অহং থেকে নিবেদনে - মানবিকতার এই উত্তরণের ধারাভাষ্য 'রাজা' নাটক। সেই ভাবনার দ্যোতক হয়ে উঠেছে সুরঙ্গমা ও সুদর্শনা।]

রবীন্দ্রনাটকে রাজা এসেছেন বিচিত্র ভাব এবং রূপ নিয়ে। কখনও রাজা নিজেই 'সংশয় তিমির'-এ আচ্ছন্ন পথের পথিক, কখনও তিনিই 'গভীর অন্ধকারে' পথের সাথী। রবীন্দ্রনাটকে রাজার দ্বিবিধ পরিচয় দিতে গিয়ে ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর 'রাজার রাজা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন -

একটি রাজা এসেছে পৌরাণিক - ঐতিহাসিক রাজা রাজড়ার সূত্র ধরে। যে রাজা প্রজার প্রভু ও পালক। ক্ষমতায় ও প্রতাপে দোর্দণ্ড অথবা উদার ও মহানুভব। প্রজারঞ্জক অথবা প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী। আর একটি এসেছে ঈশ্বরানুভূতি থেকে। এই দ্বিতীয়টি হলেন রাজার রাজা, মহারাজ, রাজন প্রভু, নাথ অথবা ত্রিভুবনেশ্বর, স্বামী, সম্রাট ইত্যাদি। ... এ রাজা যেহেতু ঈশ্বরের সামিল, সেই হেতু তাঁর ক্ষমতার কিনারা নেই। ... জীবন মৃত্যুর আসা যাওয়ার দুটি দরোজা খুলে রেখে সংসারকে তিনি চিরনবীন করে রেখেছেন। এই দৃশ্যজগৎ এই রূপসাগরের গভীরে তিনি অরূপরতন।'

এই রূপসাগরের 'রাজা' বা 'অরূপরতন'-এ সুদর্শনা এবং সুরঙ্গমা উভয়কেই ডুব দিতে হয়েছে। সুরঙ্গমা ডুব দিয়েছে এবং তাতে সার্থক হয়েছে নাট্যঘটনা সূচনার পূর্বেই। আর সমগ্র নাটকে জুড়ে আছে সুদর্শনার রূপের অতলে অরূপকে খুঁজে চলার কাহিনী। এই

খুঁজে ফেরার কাজে তার সাথী সুরঙ্গমা। সে শুধু ইঙ্গিতটুকু দিয়ে গেছে, কিন্তু 'পাথর বিছানো' পথে হাঁটতে হাঁটতে রাজাকে অথবা নিজেকে খুঁজে নিতে হয়েছে একলা সুদর্শনাকেই। প্রমোদ উদ্যান থেকে বেরিয়ে মানস উদ্যানে রাজাকে বসিয়ে তবেই 'পথ হল অবসান'।

'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' বা 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি নাটকে রাজা, প্রজার প্রভু মাত্র। অধ্যাপক মজুমদার প্রথম যে শ্রেণীর রাজার কথা বলেছেন তাঁরা সেই ধরণের। এঁদের মধ্যে 'বিসর্জনে'র রাজা গোবিন্দমাণিক্যই সম্পূর্ণ ইতিবাচক চরিত্র। আর তাই বোধহয় সে উপন্যাসের আখ্যানে অবলম্বনে এই নাটক তৈরী হয়েছিল। সেই উপন্যাসের নাম 'রাজর্ষি'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাটক পর্ব থেকেই রাজার স্বরূপ গেছে বদলে। 'মুক্তধারা' নাটকের রাজা বিশ্বজিৎ পূর্বের রাজাদের মত হলেও তাঁর রাজত্ব গ্রাস করেছিল যন্ত্র। 'অচলায়তনে'-এর রাজা মন্থরগুপ্ত আসলে রাজার নামধারী ব্যক্তি, প্রকৃত রাজা সেখানে গুরুই। শান্তিনিকেতন পর্ব থেকেই রাজা শুধু ঋষিমাত্র নন, তিনি 'জীবনদেবতা'ও বটে। ১৯০১-এ প্রকাশিত 'নৈবেদ্য' কাব্যে রাজা ও প্রভুর অদ্বৈত রূপ নির্মিত হয়েছে -

যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।
যদি কোনদিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে
চিরদিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।।

এভাবেই তিনি 'নৈবেদ্য' কাব্যে 'জীবননাথ'কে স্মরণ করেছেন। 'অর্ঘ্য' সাজিয়েছেন তাঁর উদ্দেশ্যে। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'তে সেই রাজা নিজেই এসেছেন ভক্তের কাছে -

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে -
প্রভু নিত্য আছ জাগি।'

কখনো তিনি রাজ-ভিখারির বেশে 'গ্রামের পথে পথে' ফিরেছেন। কার্পণ্যের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে সে 'রাজাধিরাজে'র আবির্ভাব, তিনি তো ইতিহাস বা পুরানের পথ ধরে

আসেন না, আসেন বোধের পথ ধরে, আধ্যাত্মিক চেতনায়, তাঁকে চিনতে পারাটাই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা, বিচিত্র রূপ ও রসের খেলায় জয়ী হওয়াই বোধের পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রার সুচক।

শরৎ ঋতুর বাহ্যিক আনন্দ উৎসবের পাশাপাশি গভীর তত্ত্বকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব' নাটক লিখেছিলেন, ব্রহ্মচর্য আশ্রমের ছাত্রদের নিয়ে অভিনয় করানোর উদ্দেশ্যে এ নাটক রচনা করলেও নতুন এক নাট্যধারার অবতারনা ঘটে গেল এই নাটকের মধ্যে দিয়ে। তবে উপনন্দের ঋণশোধের মধ্যে সাংকেতিকতা থাকলেও মূল কাহিনীর রহস্য গড়ে উঠেছে রাজসন্ন্যাসী অর্থাৎ বিজয়াদিত্যের ছদ্মবেশ অবলম্বনে। সেখানে অত্যন্ত বড় কাজের ছোট উপদেশ হল -

'রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।'

কিন্তু 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি'তে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না, তাই কঠোর সাধনায় তাঁর সন্ন্যাসীরা শুষ্ক নন। বরং যথার্থ মাধুর্য্যের সন্ন্যাসীর আকাঙ্খাই রবীন্দ্রনাথ বার বার প্রকাশ করেছেন। 'রাজা' নাটকের রাজা তো তেমনই - তিনি রাজবেশের আড়ালে নিজেকে সরিয়ে রাখেন না। তাই তো ঠাকুরদা বলতে পারেন -

'সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তার গায়েও ধুলো মাখা।'

এই রাজার অবস্থান 'সিংহাসনের আসন' -এ নির্দিষ্ট হয়নি বরং বলা যায় -

অহংকার তো পায় না নাগাল সেথায় তুমি ফের
রিক্ত ভূষণ দীন দরিদ্র সাজে।
সবার পিছে সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।
ধনে জনে সেথায় আছে ভরি সেথায় তোমার সংগ আশা করি,
সঙ্গী হয়ে আছে সেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না সে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।।

এই গর্বিত উদ্ধত হৃদয়কে পথের ধূলায় নামিয়ে এনে 'রাজা' নাটকে যাত্রার পরিসমাপ্তি। সবহারাদের সঙ্গে মিলে 'চরণধূলায় ধূসর' হতেই হয়েছে। সেখানে রাজার দাসী প্রেয়সী, শত্রু- মিত্র সবাই মিলেমিশে একাকার। প্রণয়িনী সুদর্শনা ও সেবিকা সুরঙ্গমা প্রেম ও পূজার অর্ঘ্য হাতে সামিল হয়েছে। উভয়েই কঠিন যন্ত্রণা পেয়েছে - বুকের মাঝে দুঃখ নিয়েই মিলনের পথে যাত্রা আরম্ভ। পথের ধূলায় আঁচল রাঙা করে যখন তাদের যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তখন এমন এক অনুভূতির দ্বারে গিয়ে পৌঁছেছে সেখানে পার্থিব রূপ রস গন্ধের মোহ থেকে তাদের উত্তরণ ঘটে গেছে।

'অরূপরতন', 'রাজা' নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ হলেও 'নতুন করিয়া পুনঃলিখিত'। এই পুনঃলিখনে আয়তন-গত সংক্ষিপ্ততা ছাড়াও আরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন গানের সংখ্যা 'অরূপরতন'-এ বেড়ে গেছে অনেক, সূচনা ও পরিসমাপ্তিও ঘটেছে 'গানের ভিতর দিয়ে'। সবচেয়ে বড় কথা সুদর্শনার সামাজিক অবস্থান বদলে গেছে। 'রাজা' নাটকে সুদর্শনা 'রাজমহিষী' - তার পূর্বপরিচয় যে কান্যকুব্জরাজকন্যা। আর 'অরূপরতনে' সে কান্তিকরাজকন্যা, রাজাকে বিবাহ করতে উৎসুক। রাজার ভাবনায়-

'আমার নাম নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহংকারে সে আমাকে চায়।'

উভয় ক্ষেত্রেই সুরঙ্গমা রাজার দাসী - সে দাসীর জীবনেতিহাস আলোয় ভরা নয়। বরং এই অনুকারের রাজার কাছে এসেই সে পেয়েছে আলোর দিশা।

প্রথমে যদি সুরঙ্গমার দিকে তাকানো যায় দেখা যাবে, সে সম্পূর্ণই রাজার কাছে নিবেদিত। তাঁর কথায় -

'... যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই, আর মনে হয় - এই আমার ঢের, আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।'

সুরঙ্গমার কাছে রাজা যেন 'মীরার বঁধূয়া' - যার প্রাণের কথা 'চাকর রাখো'। সুরঙ্গমাও তার আপন সুরে গেয়ে যায় -

আমি কেবল তোমার দাসী
কেমন করে আনব মুখে 'তোমায় ভালোবাসি'।

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ভালোবাসায় গভীরতা যত বেশি, তার প্রকাশ তত কম। সুরঙ্গমা বা ঠাকুরদা চরিত্রগুলি এই ভাবনাতেই গড়ে উঠেছে। তবে সুরঙ্গমার পূর্ব জীবন কিছুটা ভিন্ন সুরেই বাঁধা ছিল। তার বাবা জুয়াড়ী এবং নিজেও সেই পরিবেশে মিলে গিয়ে রূপোপজীবিনী হয়ে উঠেছিল - নষ্ট হবার পথ তবে খোলাই ছিল। নিষ্ঠুর ভয়ানক কঠোর রাজার জন্যই জীবনের মূল ছন্দে ফিরে আসে সে। 'কাঁচা বয়সের মায়া'য় বহু পুরুষ তার সুখ- দুঃখকে তীব্র 'নাচন নাচিয়ে' বেড়িয়েছিল। সেই ব্যাভিচারময় জীবন থেকে সরে আসা সহজ হয়নি সুরঙ্গমার। ব্যাভিচারের পথ যখন বন্ধ হল, 'খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মতো' ছটফট করে বেড়িয়েছে সে। রাজার 'অবিচলিত নিষ্ঠুরতা'র কাছে মাথা কুটে মরেছে। নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ অর্থহীন মনে হয়েছে তার। এই নিষ্ফল আক্রোশই পরে অবিচল ভক্তিতে পরিণত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত -

'সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।'

তখনই সে প্রকৃত সুন্দরের সন্ধানে পেয়েছে, যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে -

‘বাপের বাড়িতে অল্প বয়সে অনেক পুরুষ দেখেছি, তাদের সুন্দর বলতুম। আমার রাজা কি তাদের মত সুন্দর। কখ্খনো না। ... হাঁ তাই বলব - সুন্দর নয়। সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভূত, এমন আশ্চর্য।’

তার মধ্যে যতক্ষণ প্রবৃত্তির দাহ ছিল ততক্ষণ সে ভিতরে ভিতরে গর্জন করে চলেছিল। মৃত্যু কামনা করেছিল সে রাজার প্রতি পরে তার প্রতিই অবিচল নিষ্ঠা জন্মেছে। কারণ রাজার প্রকৃত শাসনের কাঠিন্যে তার মোহ ছিন্ন হয়েছে - পিতৃগৃহে সে মধুরসে বিহ্বল হয়েছিল, পরবর্তী কালে তাকে ‘মধুমাখা ভ্রান্তি’ বলে বুঝিয়ে তবেই ছেড়েছেন রাজা। যখনই এই ভ্রান্তি ঘুচেছে তখন থেকেই সে রাজার একান্ত অনুগত। রাজার যে কোন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেই সে ইতিবাচক বিশেষ ভাবনা আছে সে সম্পর্কে সুরঙ্গমা নিশ্চিত -

‘‘আমাকে সে দিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বললেন ‘সুরঙ্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখো এই তোমার কাজ’ তখন আমি তার আজ্ঞা মাথায় করে নিলুম - আমি মনে মনেও বলিনি, ‘যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও’। তাই সে কাজটি নিলুম তার শক্তি আপনি জেগে উঠল, কোনো বাধা পেল না।’’

তার বিশ্বাস ‘অন্ধকারের মাঝে’ চেতনার আলো জ্বেলে রাজাই পথ দেখাবেন। কারণ ভীষন বা রুদ্র রূপে তিনিই তো সুরঙ্গমাকে ‘খেলা ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে নিয়ে গেছেন, ‘দুঃখ সুখের পারে’। রাজার অগ্নিবেশের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন সে। যদিও তার এই অটল বিশ্বাস ও অটল আত্মনিবেদন সবাই বিশ্বাস করেনি, তাই রাজার ভৃত্য মহলে সে কিছুটা একঘরে। আর এক দাসী রোহিনীর সংলাপে তা স্পষ্ট -

‘ও তার ভান। ... আমরা যদি ওর মত নিলর্জ্জ হতুম তা হলে অমন কথা আমাদেরও মুখে আটকাত না। ... কত ছলই সে জানে ! ঐজন্যেই তো আমাদের কেউ তাকে দেখতে পারে না।’

এই অবহেলা সুরঙ্গমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। রাজাকে অন্তরে পেয়ে তার মাত্রাও থেমে যায় নি। রানী সুদর্শনার ভ্রান্ত পথে দিশা দেখানোর দায়িত্বও সে নিয়েছে। রানীকে কৃপা করার জন্য অনুরোধ করেছে রাজার কাছে -

‘সেই দুঃখই তাকে দিয়ো, তাকে দিয়ো ... এই সুযোগে তার অহংকার দাও ভেঙে। সকলের নীচে নামিয়ে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে এসো তাকে।’

সুদর্শনার মনের দ্বন্ধ, তার উচ্চাশা সম্পর্কে সচেতন সুরঙ্গমা; সেই দ্বন্দ্বের অবসান

এবং মানসিক উন্নতির জন্যে এই পথই সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে হয়েছে তার। 'রাজা' ও 'অরূপরতন' দুটি নাটকেই যথাক্রমে রাজমহিষী ও রাজকন্যা রূপে তার আত্মপ্রকাশ ঘটলেও যন্ত্রনার পথ উভয় ক্ষেত্রেই সমান। ছায়াতরুহীন মরুপথ ধরেই তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে - সেই পথকে অন্তবিহীন বলেও মনে হয়েছে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই বিশ্বাসের সুধাপাত্র নিয়ে সুদর্শনার সাথী হিসাবে রয়ে গেছে সুরঙ্গমা, বৈষ্ণব শাস্ত্রের মঞ্জরী ভাবের সাধিকা বলে মনে হয় তাকে। তার মন্ত্রই সুদর্শনার অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাবার অবলম্বন। এই যাত্রা মনে করায় রবীন্দ্রনাথের আরও এক নারী চরিত্রকে - 'ঘরে বাইরে'র বিমলা। তাকেও হাঁটতে হয়েছিল আগুনের ভিতর দিয়ে। সেই আগুনেই ঘটেছিল বিমলার চিত্তশুদ্ধি ও মোহমুক্তি। নিখিলেশের গভীর প্রেমকে অস্বীকার করে সন্দীপের চাপল্যের কাছে নিজেকে সমর্পন করতে উদ্যত হয়েছিল সে। নিখিলেশও সেখানে রাজার মত স্থির, অচঞ্চল এবং কর্তব্যে অবিচল। সে বলতে পারে -

'আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব'।

এই অপেক্ষা রাজাও করেছিল সুদর্শনার জন্য, এমনকী সুরঙ্গমার জন্যে। রাজার এই অপেক্ষার প্রতি সুরঙ্গমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলেই সুদর্শনাকে সে পথে বার করতে পেরেছিল।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'এ আমির আবরণ' গ্রন্থে 'রাজা' নাটকের সঙ্গে 'গীতাখ্য কাব্য তিনটি'র সধর্মের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'তিনতলা' প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

'তিনটে বড়ো বড়ো স্তরে মানবজীবন গড়ে তুলেছে - একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্মনৈতিক, একটা আধ্যাত্মিক।'

প্রথম স্তরে উপলব্ধির কেন্দ্রে দাঁড়ায় প্রকৃতি। যা ছুঁয়ে অনুভব করা যায় তাকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করা হয় এই স্তরে। পরে এ ব্যাপারটিকে যখন মূঢ়তা বলে মনে করা হয় তখন 'বাহিরকে নিঃশেষে নিরস্ত করে দিয়ে' অন্তরে বাসা বাঁধা হয়। বাসনার পায়ে শিকল পরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই আত্মশাসন যখন প্রবল আকার ধারণ করে তখন মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে। এরপরেই ভিতর আর বাইরের দ্বন্দ্ব ঘুচে চিদাকাশে ফুটে ওঠে এক আনন্দজ্যোতি -

'তখন ভিতরের বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। তখন জয় নয়, তখন আনন্দ; তখন সংগ্রামে নয়, তখন লীলা; তখন ভেদ নয়, তখন মিলন; তখন আমি নয় তখন সব - তখন বাহির ও নয়, ভিতর ও নয়, তখন ব্রহ্ম - তচ্ছুভ্রংজ্যোতিষাৎ জ্যোতিঃ।'

এই পূর্ণের চরণের কাছে সুদর্শনাকে ঠাঁই দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ তার ক্রম উত্তরণ বা আত্ম উন্মোচন ঘটালেন নাট্যকাহিনী নির্মাণের মধ্য দিয়ে। নিজের রূপের প্রতি তার ছিল প্রবল অহংকার, তাই সে সুরঙ্গমাকে বলেছে -

'তোমার মত আমি অত বেশি নম্র নই, আমি শক্ত আছি। সকলের কাছে তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন - এ তিনি এড়াতে পারবেন না।'

তাই তার প্রেমার্ঘ্য সরাসরি সত্যের কাছে পৌঁছয়নি। যদিও সে সুন্দরের উদ্দেশ্যে তার অর্ঘ্য প্রেরণ করেছিল তবু সেই সুন্দরের ভিতর ছিল চরম ভন্ডামি, মুখের বদলে ছিল মুখোস। সুদর্শনা তার অপরিমার্জিত চিত্তমুকুরে সেই মুখোসকেই মুখ ভেবেছে। বাহ্যিক সৌন্দর্যের ভন্ডামি ছিল সেখানে - সত্যের বিন্দুমাত্র স্বরূপ সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সুবর্ণর টকটকে লাল কিংশুক ফুলের ধ্বজা, আর উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ দেখে দাসী রোহিনী-র হাতে তার জন্য বরমাল্য প্রেরণ ভরে ফেলে সুদর্শনা। রাজার প্রকৃত রূপের সন্ধান পেয়েছে যে সুরঙ্গমা, তার জন্য অপেক্ষাও করতে পারে না। রানী সত্য-মিথ্যার ভেদ, বোঝে না বলেই আলো অন্ধকারের তারতম্যও বুঝতে অসমর্থ হয়। সেই অন্ধকার ঘরে পরমের সঙ্গে নিবিড় মিলনের প্রকৃত সত্য উপলব্ধিতেও যে অক্ষম -

'এই সে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘুমের মতো, মুর্চ্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় আমাতে তোমাতে মিলন হবে কেমন করে? না না, হবে না মিলন, হবে না।'

এখানেই সুরঙ্গমার সঙ্গে সুদর্শনার পার্থক্য - বিশ্বাসের যে ভিত সুরঙ্গমা তার সাধনার মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলেছিল, সুদর্শনা সেই সাধনার প্রাথমিক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে। প্রেমের মধ্যে কেবল আলো আর ভালোকে খুঁজে বেড়িয়েছিল সে। দুঃখ-সুখের দোলায় 'রাজার দুলালী' সুদর্শনা জীবনকে চিনতে সক্ষম হয়নি, তখনও। এই কারণে অনাঙ্কাকিত পুরুষকে প্রণয় নিবেদন করে বহু পুরুষের লোভী দৃষ্টির সন্মুখে পড়তে হয় তাকে। অহংকার মুক্ত হলে তবেই যার দর্শন মেলে, তাকে দেখবার জন্য সেই অহংকারের বীজ তিনিই সমূলে উৎপাটন করে দেন। সুবর্ণের সত্যকার পরিচয় পেয়ে রানী সুদর্শনা হাহাকার করে ওঠে -

'রাজা নয়! এ রাজা নয়! তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে, আমি তোমারই হাতে সমার্পন করব। হে পাবন, আমার লজ্জা, আমার বাসনা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো।'

আগুনে যখন সব আগুন ময় হয়ে উঠেছে তখনই রাজাকে দেখে সুদর্শনা - সে রাজা সুদর্শন নয়। যার মনে মোহের কালিমা লিপ্ত হয়ে আছে সে তো তার রাজাধিরাজকে

কালোই দেখবে। কারণ বাইরের আলো ব্যতীত অন্তরের চেতনা দিয়ে দেখবার যে বোধ তা তো সুদর্শনা পায়নি। 'শাপমোচন'এর কমলিকার মত তার নিজেকে প্রবঞ্চিত বলে মনে হয়েছে। নিজের কৃতকর্ম ও রাজার রূপ দুয়ের প্রতি তীব্র ক্ষোভে সে রাজবাড়ি ত্যাগ করেছে। চেয়েছে রাজা তাকে জোর করে ধরে রাখুক। নিজের মূল্য সম্পর্কে তখনও তার বেশ উচ্চ ধারনা। তার এই রাজবাড়ি ত্যাগকে কেন্দ্র করে বিরাট কিছু ঘটে যাবে এমনও আশা পোষণ করেছে মনে। এই কারণেই সে রাজাকে সম্পূর্ণ করে পায়নি, শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে। সুরঙ্গমার নিষ্ঠার প্রতি কটাক্ষ করলেও মাঝে মাঝে তাকে উপেক্ষা করতে পারে না। রোহিনীর তোষামোদের বদলে সুরঙ্গমার সত্য ভাষনই তার কাছে কাঙ্খিত।

রবীন্দ্রনাথের বিবিধ নাটকে রাজার অবস্থান বহুমাত্রিক। রক্তকরবীর রাজা শক্তির প্রতীক - শূন্যতার প্রতিভূ ; প্রবল প্রতাপে সে তাল তাল করে আনা জমায়, অথচ তার শোভা শূন্যতায়। সে ঈর্ষা করে সুন্দরকে। আর ডাকঘর-এর অমলের রাজা অসীম বা পূর্ণতার প্রতীক - মুক্তির দূত। তারই চিঠির অপেক্ষা করে থাকে বালক অমল। কিন্তু 'রাজা' নাটকের রাজা যেন প্রত্যেক চরিত্রের প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে। যে তাকে যেভাবে দেখতে চান, তিনি সেই রূপেই ধরা দেন। তাই তো তিনি ঠাকুরদার মিত্র, কাঞ্চীরাজে (রাজা) বা বিক্রমবাহু (অরূপরতন')-র শত্রু, সুরঙ্গমার প্রভু আর বিরূপাক্ষের মত ব্যক্তির রাজা কুৎসিত, কারণ -

'ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে, আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে।'

রানী সুদর্শনা প্রমোদবনে রাজাকে দেখতে গেলেন, দেখা পেলেন সুবর্ণর - সে জুয়াড়ী। রূপ ও অর্থের নেশায় সে ডুবে থাকে। যার নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ মিথ্যা - তাই সর্বত্রই তা ঘোষনা করে বেড়াতে হয়। মিথ্যা রাজা সাজার কারণে অন্য রাজাদের পায়ে অবনত হতে হয়। রানীর রূপজ মোহ তাকে এমনই 'ভন্ডরাজ'এর সন্মুখে দাঁড় করিয়েছিল। এই মিথ্যা ধারনা সরে যেতেই দেখা পেয়েছে সত্যিকারের রাজার। সুবর্ণর রূপকে মিথ্যা বলে মনে হয়েছে -

'ঐ সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ - চোখকে কী দিয়ে ধুলে এর গ্লানি চলে যাবে।'

সুরঙ্গমা রাজার অতল কালো রূপের মধ্যে সেই গ্লানিকে ধুয়ে নেবার কথা বলেছে। কিন্তু রানীর প্রবল অভিমানের জোয়ারে রাজার প্রতি তার অভিসারের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। অভিমানে পুনঃরায় ভন্ডরাজকে বিশ্বাস করতে চেয়েছে। কিন্তু ফিরতে হয়েছে রাজার দিকে, বা বলা ভালো তার দৃষ্টি ফিরেছে সত্যের দিকে, প্রকৃত সুন্দরের দিকে।

যে আগুনকে দেখে সবাই ভয় পেয়েছে, সেই আগুনেই বিশ্বাস সুরঙ্গমার -

'রাজাই আছেন ওই আগুনের মধ্যে। তিনি আমাকে পুড়িয়ে নেবেন।'

এরপরেও সুদর্শনার দেরি হয়েছে রাজাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে বা বলা ভালো রাজার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে। কারণ সে নিজেই স্বীকার করেছে -

'রূপের নেশা আমাকে লেগেছে; সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমার স্বপনশুদ্ধ ঝলমল করছে।'

রূপমোহ পেলেও তার নিজের সামাজিক মান যায় নি -

'অতোবড় রানীর পদ একমুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে এলুম সে কি এমনি কোণে লুকিয়ে ঘর ঝাঁট দেবার জন্য।'

তীব্র অভিমান নিয়ে রাজার জন্য অপেক্ষা করেছে সুদর্শনা। অভিমানের ঋধা এমনই যে আঁধার কাটেনি। অবশেষে অতল কালোর মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে অনুভব করেছে রাজাকে-

'এ অন্ধকার ডুবাও অতল অন্ধকারে
ওহে অন্ধকারের স্বামী

সকল ঝরে সকল ভরে আসুক সে চরম,
ওগো মরুক না এই আমি।'

আত্মগ্লানির তুষানলে জ্বলতে জ্বলতে বিমলার মনে হয়েছিল - 'আমি সরলেই সব বিপদ কেটে যাবে।' আর বেদনার শীর্ষে পৌঁছে সুদর্শনার মনে হয়েছে -

'তবে আসুক মৃত্যু, আসুক - সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর, তোমার মতই সে মন হরণ করতে জানে। সে তুমিই সে তুমি।'

এই মৃত্যু চেতনাই তার মনে পরমের পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছে। আনন্দ আর বেদনার দোলা একই সঙ্গে জোগে উঠেছে তার বুকে। স্বীকার করেছে সুদর্শনা নিজের পরাজয়কে। রাজাকে জয়ী করে সে নিজেই জিতে গেছে। সুরঙ্গমার পরামর্শে সেই 'নিবেদন করবার ইচ্ছা' তার মনেও বেজে উঠেছে গভীর সুরে। সুরঙ্গমা ও সুদর্শনার ইচ্ছা মিলে গেছে একই ভাবনায় -

'সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা - দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া।'

তার অন্ধকারের কান্না থেমেছে। 'অভিমানের বদলে' রাজার মালা গ্রহণ করার জন্য পথে বেরিয়েছে নিরাভরণ হয়ে। বহুপূর্বেই সুরঙ্গমা বলেছিল যে যাঁর দাসী তিনি সুরঙ্গমাকে নিরাভরণ বেশেই সাজিয়েছেন। সেই রূপই তার অলংকার। লোকের কাছে গর্ব করার মত কোন কিছুই রাজা তাকে দেননি। সুদর্শনাতে শেষ পর্যন্ত এই ভাবনাতে বিশ্বাস রেখেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে, কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে চলেছে রাজার কাছে। এমনকি এই পথে চলার অহংকারও তার টেকেনি, কারন এর পূর্বে রাজা নিজেই এসেছিলেন তার কাছে - বীনার তারে সুর বেঁধেছিলেন কঠিন মুর্চ্ছনাতে। তিনিই পথে বের করেছেন। সুদর্শনাও সুরঙ্গমার মত বলতে পারে -

'সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়েছেন, সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন - বেঁচেছি বেঁচেছি। আমি আজ তাঁর দাসী - সে কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নীচে। ... আজকের দিনের অভিমানের সেই ধুলোই সে আমার অঙ্গরাগ।'

নাটকের একেবারে অন্তিম পর্বে অন্ধকার ঘরে কেবল রাজা ও সুদর্শনা, সেখানে তাদের মাধ্যমে হিসাবে আর সুরঙ্গমা নেই। তার প্রয়োজন ও তখন আর নেই। এমনও ভাবা যেতে পারে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা মিলেমিসে একাকারে হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরের লীলা শেষ হবার পূর্বে তাই সেই 'অন্ধকারের স্বামী' কিংবা 'প্রাণের ঠাকুর'কে প্রণাম জানিয়েছে সুদর্শনা।

বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী থেকে এই আখ্যানভাগ গৃহীত, তবে কোন ধর্মীয় প্রভাব এখানে নেই। এক কথায় এ নাটক আত্মোপলব্ধির নাটক। 'সকল অহংকার'কে চোখের জলে ডুবিয়ে দেবার নাটকও বটে। সত্য ও সুন্দরের সে পরিপূরক অবস্থানের কথা তাঁর 'সৌন্দর্যবোধ প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন, জীবনবোধের ভিতরেও গভীরভাবে তা সে প্রোথিত করে রাখা প্রয়োজন তা দেখালেন এ নাটকে। এ নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইনুর তাঁর 'পান্থজনের সখা' গ্রন্থে লিখেছেন -

'দুই হাতে সুধার সঙ্গে গরলও ঢেলে দিচ্ছেন সেই অতি নিষ্ঠুর ভয়ংকর প্রেমিক, সেই সুদর্শনার আদর্শ স্থানীয় কালো রাজা, যাঁর পতাকায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা। তাঁরই আদেশে সমুদ্রে ভীষন ঝড় ওঠে, তীর্থযাত্রী জাহাজ ডুবে যায়, সাত-আটশো নিরীহ নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ অসহায় যন্ত্রনায় দম আটকে প্রাণ হারায়। ... ক্রমশ দুঃখের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।'

কিন্তু 'নিবিড় ঘন আঁধারে' পথ হারিয়ে স্তব্ধ হয় না রবীন্দ্রচেতনা বরং ঝড়কে ও 'জয়ধ্বজা' বলেই বিশ্বাস করতে চান। তাই এ নাটকের শেষে সবাই মিলে যখন তাদের

রাজার কাছে পৌঁছে গেছে তখন পূর্ব দিক রাঙা হয়ে উঠেছে, প্রাসাদের সোনার শিখরে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে, আর রামকেলি রাগে বেজে ওঠে জাগরনের গান -

'ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে, লোকে উঠে আলোকেরই গান।
লজ্জা ভয় গেল ঝরি, ঘুচিল রে অভিমান।।'

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

আকর গ্রন্থ ঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (দ্বাদশখন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, ২০১৫।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. আবু সয়ীদ আইয়ুব, 'পান্থজনের সখা', দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩।

২. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, 'নবীন রাজা', প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮।

৩. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা), 'রবি বন্দনা', সাহিত্যম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (১ম- ১৬শ খন্ড) , পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, ২০১১ - ২০১৬।

৫. শঙ্খ ঘোষ, 'এ আমির আবরণ', প্যাপিরাস, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯১।

৬. শঙ্খ ঘোষ, 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' দে'জ, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯।

দেশভাগের ইতিকথা ঃ ঋত্বিক ঘটকের বাংলা নাটক

সৌরভ মণ্ডল

ঋত্বিক ঘটকের দরদী সমাজতাত্ত্বিক মনে ভেসে ওঠা দেশভাগ প্রস্তাব পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের চক্রান্ত ও ভূমিকার প্রকৃতি, গ্রামীণ সহজ সরল মানুষের অসহায়তার ছবি, চারিদিকে মহামারী আক্রান্ত লাশের সমাবেশ, কখনো বা নিজ অস্তিত্বের সঙ্গে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে প্রতিবাদীমুখর সাধারণ মানুষের মন তা তাঁর 'দলিল' (১৯৫১-৫২) ও 'সাঁকো' (১৯৫২) নাটক দুটির প্রতিচ্ছবি।

'দলিল' নাটকে দেশভাগের প্রত্যক্ষ ছবি ধরা পড়েছে। স্বাধীনতার পরমুহূর্তেই পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি প্রশাসন ও সামরিক বাহিনী এবং মৌলবাদীদের তৈরী আলবদর প্রভৃতির অত্যাচারে পূর্ববঙ্গ থেকে গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করেছিল। এই সকল বাস্তুহারা জীবনের দুর্বিষহ অবস্থার চিত্র ঋত্বিক ঘটক 'দলিল' নাটকে তুলে ধরেছেন। নাট্যকার নিজেই ছিলেন উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে। তাই নাটকের উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন -

> ''উদ্বাস্তু মনোভাবের প্রতিটি অনুরণন
> আমি পেয়েছিলাম আমার বাবার মধ্যে।
> যে বাবার জীবনকালে কোনদিন আমি
> তাঁকে কিছু দিতে পারিনি - সেই আমার
> পরমপূজনীয় স্বর্গত বাবার উদ্দেশ্যে আমার
> প্রথম প্রচেষ্টা উৎসর্গীকৃত হল।''

(দলিল - ঋত্বিক ঘটক, উৎসর্গপত্র , গণনাট্য নিউ মাসেস পাবলিকেশন)

'দলিল' নাটকের প্রথমাংশে দেশভাগের পূর্ববর্তী অবস্থায় পূর্ববাংলার রূপাই কান্দী গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের সুন্দর সহাবস্থানের চিত্র এবং দ্বিতীয়াংশে দেশভাগ পরবর্তী সময়ে শেয়ালদা স্টেশনে হিন্দু উদ্বাস্তু মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারবোধে সংগ্রামে মেতে ওঠা নিম্নবর্গীয় সমাজের (Sub altern Society) মানুষের হাহাকারের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। দেশভাগের পূর্বে রূপাই কান্দী গ্রামে ক্ষেতু ঘোষ, কলিম শেখ, কিরু শেখ

ইত্যাদি নিম্নবিত্ত পরিবারের সুখী জীবনযাপনের ছবি ধরা পড়েছে। নাটকের কাহিনীতে দেখা যায় ক্ষেতু ঘোষ তার দুই ছেলে গোপাল, মহিন্দর ও কন্যা পদ্ম, মহিন্দরের স্ত্রী স্বর্ণ ও ছেলে হারুকে নিয়ে সুখের সংসার। কিন্তু পরমুহূর্তেই হঠাৎ দেশবিভাগের খবর রেডিওতে প্রচার হলে অসহায় মানুষদের প্রতিক্রিয়া নাটকের সংলাপে লক্ষ্য করার মতো।

''হরেন ঃ জানো না হে, আজই তো দেশ বিভাগের খবরটা বারাবে রেডিওতে।

গোপাল ঃ রেডিওতে?

হরেন ঃ বেতারযন্ত্রে। মানে, নেতারা ঠিক কর‍্যাছে, চাণক্য শ্লোকই জ্ঞানের পরম আধার - অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

গোপাল ঃ মানেটা কী হল?

হরেন ঃ মানেটা হল, আমার পেরাইমারি ইস্কুলটা উঠাবার হল। এত খাট্যা, গুরু ট্রেনিং পাশ কর‍্যা স্কুল বসালাম ই গায়ে, মিট্যা গেল। এখন তল্পি গুটাইয়া রওনা দেওয়া লাগবে উপার।''

কিন্তু, ভিটে মাটি ছেড়ে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা তাদের। ভিটে মাটির সোঁদা গন্ধ, জানলা দিয়ে বয়ে আসা নির্মল বাতাস, পাশে পদ্মার বালির আস্তরণ ঘরের আনাচে কানাচে, গাঙ্গের উপর থেকে ভেসে আসা জমাটি গানের সুর যেন স্বপ্নের দেশে নিয়ে যায় তাদের। চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে আসার সংকেত পেয়েও ক্ষেতু ঘোষ মরণকে অতিক্রম করে ভিটে মাটি আঁকড়ে ধরে থাকার সাহস দেখায়। কিন্তু, পরবর্তীতে সংসারের কথা ভেবে বাধ্য হয়ে সবকিছু কলিমের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে চলে যাওয়ার জন্য মনকে মানিয়ে নেয়। চলে যাওয়ার মুহূর্তেও হিন্দু মুসলমানের অটুট বন্ধনের দীর্ঘশ্বাস চোখে পড়ার মতো -

''কলিম ঃ চাচা, ভাইব না, ঘর হামি দেখব, দেখব হামি। বহরের সাথ লাও লয়্যা যাব। আবার কবে বা দেখব চাচা! বউঠান, আমাহেরা ভুলবা না তো? ভুইল না। পদ্ম বোন, হামার দিঘির পাড়ে ইবার বর্ষাতেও কলমির শাক গজাবে, কিন্তুক তুই তো থাকবি না রে। কিন্তুক দেখা একদিন আমাহেরা হবেই চাচা, ইনা হয়্যা যায় না। উদেশে গিয়ে ঠিকানা দিয়ো - চাচা, বউঠান, পদ্ম, - খোদা হাফিজ।

কলিম জোরে হেঁটে চলে যায়। গোপাল স্তব্ধ হয়ে বাঁধে উঠে নদীতে কী যেন দেখছে।''

স্থানান্তরিত হয়ে তারা কখনো 'রিফিউজি', কখনোবা 'শরণার্থী' আখ্যা পায়। নিজ

আত্মসম্মান হারিয়ে, নিজ আশ্রয় হারিয়ে, নিজ অস্তিত্ব খুইয়ে আজ তারা এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে লড়াই করে খুঁজে বেড়ায় সামাজিক চাহিদা প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়। উদ্বাস্তুরা সাধারণত রেলপথে ভারতে এমনকি অনেকে পায়ে হেঁটে পশিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চলে আসত। প্রথম দিকে উদ্বাস্তুদের জন্য বনগাঁ ও বানপুরে রিসেপশন সেন্টার খোলা হয়েছে এবং স্লিপও দেওয়া হয়েছে প্রমাণ স্বরূপ। পরে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে। সরকার কাশীপুর, উল্টোডাঙ্গা ও ঘুঘুরিতে কিছু পাটের গুদাম ভাড়া নিয়ে উদ্বাস্তুদের থাকার ব্যবস্থা করলেও প্রচুর উদ্বাস্তু থাকার কোনো জায়গা প্রথমে পেত না। তাই শেয়ালদা স্টেশনের ট্রেন আসার হুসহাস, ইঞ্জিনের হুইসিল, লোকজনের কোলাহলের মধ্যেই তাদের দিন-রাত্রি গুজরান। তারা অতিথি হয়ে উঠল নিজ দেশেই। মাথা গোঁজার ঠাঁই পেল না, পারল না নিজেদের অধিকার টিকিয়ে রাখতে। তাই নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সেখানেই পোষাকি ভদ্র মানুষের সঙ্গেও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে -

''মহিন্দর ঃ হেই!...

ভদ্রলোক ঃ লেগে গ্যাচে হঠাৎ।

মহিন্দর ঃ লেগে গ্যাচে। মানুষ দেখেন না?

ভদ্রলোক ঃ তো রাস্তা আটকে শুয়ে থাকবে তোমরা সব। শেডটা তো শোবার জন্য নয়। সে যাতায়াতের জন্য।

মহিন্দর ঃ শুবার জাগা দেন, দেন জাগা। শখ কর‍্যা শুই না আমরা?

ক্ষেতু ঃ যাব্যার দে বাপু। পেরভাত কালটাত আর খেজালত করিস না।''

দেশবিভক্তি শুধুমাত্র দেশ ভাগ করা নয়, মানুষের মনের ভাঙন ধরানো, সাধারণ মানুষকে পথের প্রান্তে দাঁড় করানো। দুর্বিষহ অবস্থায় দিন কাটানো গ্রামীণ হিন্দু-মুসলমান পড়শিদের মধ্যে ব্যবধানিক মনোভাব গড়ে তোলা - তা সংলাপের মধ্যে দিয়ে আমরা খুঁজে পাই -

''গোপাল ঃ আমাহেরা কি লড়বার হবে নাকি, পাকিস্তান হয়্যা গেলেই?

হরেন ঃ বাঃ, মুসলমানের দ্যাশ, তারা সহ্য করবে কেনে তুমারে?

গোপাল ঃ তাত কী!... কলিমও তো মুসলমান, ফিরোজানানিও তো মুসলমান। আমাহেরা পড়শি, উয়ারা -

হরেন ঃ উয়ারা মুসলমানের মধ্যেকারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, হিন্দুদিগের

সাথ সম্প্রীতি রাখব্যার চায়। কিন্তু নোয়াখালির কথা স্মরণ আছে? আসবে ফরেন মুসলমান, ভিন জাগার। আমি খুবই উৎকণ্ঠায় আছি, আজই রোয়েদাদ ঘোষণা করার ...এই।"

ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' নাটকে শুধু সমস্যার কথাই স্থান পায়নি। গণনাট্যের আদর্শ অনুযায়ী সেখানে প্রতিবাদের দৃশ্যও ধরা পড়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাসবাণীতে কিছু টা সম্বিত ফিরে পেলেও তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি, সেকথা তারা উদ্বাস্তু হয়ে শেয়ালদা স্টেশনে পা ফেলেই বুঝে যায়। কার স্বার্থে এই দেশভাগ - সেকথা বাস্তুহারা জনতার অজানা থাকে না। এদিকে অর্জুন মালাকারের পাগলের মতো অবস্থা হয়ে পড়ে, খোঁজ করতে থাকে প্রধানমন্ত্রীর পূর্ববঙ্গের জমির দলিল নিয়ে -

"অর্জুন ঃ দেখবা! (হেসে) ইয়ে - দলিল। নাকাল্যাত্ ভিটা ছাড়্যা আইলাম। জোর কর্যা লয়্যা আনল উয়ারা। কইল বুড়া, দলিল পরে দেখাইবা, তো সব মিলা যাইব। হিন্দু সরকার কত যে সুব্যবস্থা করছে।

গোপাল হো - হো করে হেসে ওঠে। হারুও যোগ দেয়। লোকটা বার দুই বোকার মতো হাসার চেষ্টা করে থেমে যায়। ক্ষেতু অবাক।

ক্ষেতু ঃ কী ইটা? দলিল? ভিট্যার দলিল লয়্যা আস্যাছ তুমি?

গোপাল ঃ ঠিক নাই। (মাথা দেখায়) কে ভুজুং দিয়্যাছে। গজবে বিশ্বাস কর্যা।

অর্জুন ঃ হেই পণ্ডিত, তার সাথ দেখা কইরা কইব, বড় কষ্ট সহলের। আমি নিজচক্ষে দেখছি। খাওনের জাগা নাই, শোওনের জাগা নাই, বন্দোবস্ত তো তোমার করাই নাগে। এতটি মানুষ অতিথ হচ্ছে।"

অর্জুন মালাকার যেন তাদের কাছে প্রেরণা কারণ অনায়াসে সে তার নিজের অধিকার ছেড়ে দিতে রাজী নয়। তাই সরকারের বিরুদ্ধেও তার খেদোক্তি। উক্ত নাটকে আমরা নিরুপায় প্রতিবাদী মানুষদের একযোগে মিছিলে দাঁড়িয়ে সরকারে কাছে আর্জি জানাতে দেখেছি কিন্তু পুলিশের কাঁদানে গ্যাসে মিছিল থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতেও দেখেছি। হরেনও অভিশপ্ত সমাজের বুকে আঘাত হানতে খড়গহস্ত হতে চেয়েছে, বুঝতে পেরেছে নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে বিকল্প ব্যবস্থা করতেই হবে নইলে ঠিকানা হারিয়ে অনাহারে মৃত্যুকে আপন করে নিতে হবে। তাই, -

''হরেন ঃ দেখ, পিকৃতির সাথ লড়াইয়ে জীব কত প্রকারে বাঁচবার প্রচেষ্টা করে। লোক বাড়ায়, নখদন্ত শাণিত করে, খাপ খাওয়াইয়া লইতে চায় নিজের দেহটারে। মনুষ্যে মনুষ্যেও করে। কিন্তুক সে তো অভিশপ্ত। তাই দেহে নয়, মনে মনে বর্ম পরিধান করা লাগবে। নাইলে এ বাজারে ভাইসা যাইবা বুঝলা।''

রাজনীতির জটিল চক্রান্তের শিকার হয়ে কলোনির মানুষদের প্রাণ শুকিয়ে গেছে, পাথর হয়ে মনকে বেঁধে রাখতে হয়েছে, চোখের জলের নোনতা স্বাদ নিতেও ভয় হয়েছে, মহামারীর কবলে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুকে সঙ্গী করে নিতে হয়েছে। এমনকি দেহ সৎকারের প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে পাশব জন্তুর খাদ্যের চাহিদা মেটাতে হয়েছে।

জীবনের সবকিছু হারিয়ে কাঙাল হয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় থেকে নিজ সম্মানের দিকে দিক্‌পাত না করে ভিক্ষা করা বা চুরি করাকে পথ চলার পাথেয় করতে অপরাধ বলে মনে হয়নি তাদের। কারণ, রেশনী ব্যবস্থা নেই, ক্যাশডোল নেই, বেচার মতো কিচ্ছু নেই ঘরে। বিছানাপত্রও সব গেছে, আছে বলতে এই শীতে একখানা মাত্র কম্বল। তাই কখনো হাতে পয়সা পেলে মহিন্দর নেশাকে সঙ্গী করেছে, খিদের জ্বালায় ক্ষেতু ঘোষ তার কর্তব্যের অধিকারে ছেলের দিকে আঙুল তুলেছে, কখনো বা প্রতিবাদের সুর তুলেছে –

''ক্ষেতু ঃ খাব্যার দে তুই আমারে। ... কাল থিকা ভুখা, এট্টা পয়সাও দিছিস্?

গোপাল ঃ তুমি –

ক্ষেতু ঃ চায়্যা আছে দেখ। ... বচ্ছর ঘুর‍্যা বচ্ছর যায়, সূর্যি উঠে আর ডুবে, উঠে আর ডুবে, হামরা অবশ হয়্যা চায়্যা দেখি। ... করবুই তো ভিখ্যা। করবুই তো চুরি।

গোপাল ঃ চেঁচায়ো না। ... মানটুক্‌ও গিছে তোমার।

ক্ষেতু ঃ চুপ যা ... উপার ঘর না মুসলমানের দেশ, ইপার ঘর না ইখানকার বাসিন্দার দেশ। - ঘর, ঘর, যার নাই, তার আবার মান।''

ক্ষেতু ঘোষের পরিবারটি উদ্বাস্তু কলোনিতে আশ্রয় পেলেও দুর্নীতির বাজারে কাজের সন্ধান মেলে না। স্বর্ণ বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সেনাদের দ্বারা চীন বা তাইওয়ানের মেয়েদের অত্যাচারের কাহিনী বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের দাঙ্গা সবকিছুতে মেয়েরা ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়েছে।

স্বর্ণর ক্ষেত্রেও নাট্যকার তাই দেখিয়েছেন। কোনো উপায় না পেয়ে নির্মম অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে স্বর্ণর উক্তি -

''স্বর্ণ ঃ ... ইজ্জৎ তোমাক খোয়াবার হবেই, কিন্তুক গরিমসি কর‍্যা এমন সময়েই খোয়াবা য‍্যাখন দেশ শুদ্ধা ঘটি বাঙ্গাল সব খোয়াইছে, ইজ্জৎ যখন সস্তা হয়্যা গিছে। এইত কর গোল।''

নাটকের শেষে পাকিস্তান থেকে আসা কলিমুদ্দিন শেখের এক চিঠি থেকে বোঝা যায় দিকে দিকে প্রতিবাদের সুর তুলেছে দেশবাসী - একদিকে জানের লড়াই, জবানের লড়াই অন্যদিকে জমিনের লড়াইয়ে মেতে উঠেছে, বুঝতে পেরেছে নিজ শক্তিকে যাচাই করার বা বাড়ানোর সময় এসে গেছে। তা কলিমুদ্দিনের আসা চিঠি পাঠের মধ্যে দিয়েই দেখা যায় -

''গোপাল ঃ -তোমাদিগের হালচাল কিছু আখবারে দেখি, শিনায় তাকত পাই। চাচা, লড়াই কর। আর আমাদিকের শক্তি বাড়াও। (বাইরের কোলাহল শোনা যায়) নানি আমার জবানিতে বাক্য লিখিবারে বলিল, - বাংলারে কাটিছ কিন্তু দিলেরে কাটিবারে পার নাই। -

ক্ষেতু ঃ (উঠে আসে) কী?

গোপাল ঃ - বাংলারে কাটিছ কিন্তু দিলেরে কাটিবারে পার নাই। দিনের নিশান খত মারফত দিবা আর নানি বলিল, নাতির শাদি দিবে, নাতির? -

পদ্ম ঃ কলিমদাদা!

গোপাল ঃ নাতির শাদি দিবে, দুলহন, কাজলার সোলেমান খলিফার বেটি লছিমন। সকলে কে কেমন আছে জানাইবা। লড়াই হইতে নূতন শক্তি পাইব। আমাদিগের হইয়া আল্লাহ্তালার দোয়া মাঙ্গিব চাচা, আধি বাংলার জবানের লড়াই আমরা জিতিব।''

'দলিল' নাটকের ভূমিকাংশে নাট্যকার যা বলেছেন তা দিয়ে এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করতে চাই - ''এ - নাটক আমি 'শেষ' করতে পারিনি। এর বুঝি শেষ নেই। আজও সে পরিণতি আসেনি। একদিন আসবে। এ-নাটকের নায়ক জনতা একদিন তা আনবে। সেই ভবিষ্যৎ পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত আজকের প্রতিটি মিছিলে। তার আসার পথের প্রতি মোড়ের চিহ্ন নিয়েই দলিল', যে-দলিল আজও লেখা হচ্ছে, এর শেষ পাতাটি লিখবে মহালেখক জনতা, তার জন্যই সে-জায়গা আমি ছেড়ে গেলাম।''

'সাঁকো' নাটকটিও দেশভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তান ও কলকাতার বুকে যে জঘন্য সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম শুরু হয় তার প্রতিবাদ স্বরূপ রচিত হয়। এখানে মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে সম্প্রীতি ও মুক্তির। নাট্যকারের মনে দেশভাগের পরিণতির ছবি গাথা হয়ে রয়েছে। কারণ তিনিও এই নির্মম নির্বাসনের শিকার। তাই তাঁর স্বপ্ন দুই বাংলাকে এক করে গড়ে তুলবার, তা তাঁর নাটকে প্রতিবাদী ভাষায় প্রস্ফুটিত। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে বিজন ভট্টাচার্য ও ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন –

> ''৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভাজনের কারণ ও পরিণতিগুলি এই দুই নাট্যশিল্পীর মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও হানাহানি বিভাজনের আগে থেকেই পুঞ্জীভূত হয়ে দেশভাগের পরে তাদের সমস্ত গলিত বিষাক্ত পুঁজ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল এবং শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক সমাজকে সমসাময়িকভাবে হলেও ছত্রভঙ্গ করে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল দুজনেই।" (স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও বাংলা রঙ্গমঞ্চ, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা - ৬১৯৯৯)

দেশভাগের যন্ত্রণায় কাতর সাধারণ মানুষেরা ঘর দোর সব হারিয়ে এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়ায় শুধুমাত্র একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবার আশায়। পার্কসার্কাস ময়দানে এক রাতে বাস্তু হারা জনতার দুর্বিষহ জীবন ক্ষিতীশেরও মনকে নাড়া দিয়ে যায়। তাই, -

''ক্ষিতীশ ঃ সেই রাতে, সমস্ত রাত, ছেঁড়া কাপড়মুড়ি দিয়ে হাজার হাজার মেয়ে আর বাচ্চা ফাঁকা ময়দানে, গোলমোহর আর কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়, পার্কের রেলিঙের পাশে, ফুটপাথের ওপরে যথাসর্বস্ব দুটো প্যাঁটরা আর ছেঁড়া বোরখা আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়েছিল। ... ঘুমোয়নি, কেঁপেছিল। ... ওদের চোখগুলো কেমন যেন নেভা বলে মনে হল সাগর, হিমে ওদের ঠোঁটগুলো নীল। ... কেন এমন হয় সাগর?

সাগর ঃ কেন?

ক্ষিতীশ ঃ ... এ ঠিক না। ... ওদের ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। যৎসামান্য রিলিফ এর ব্যবস্থা করেছে পাড়ার সাধারণ লোকে, তাতে কিছুই হচ্ছে না। আমিও মেতে গেলাম ওদের সেবা করতে, - দরিদ্রনারায়ণ, সর্বস্বহীন। বারবার আমার ঢাকার কথা মনে হচ্ছিল সাগর, আমি

কিছুতে চেপে রাখতে পারছি না আর। তোমার মিলি আর খোকনটাকেও যদি এমনই করে রাত কাটাতে হয়? এমনই ভিক্ষার অন্ন পেতেও পারে, না-ও পেতে পারে। তার থেকেও সাংঘাতিক যদি কিছু, - যদি ওরা আর ... আমি খেতে গেলাম সাগর।"

ধনী রাজনৈতিক নেতাদের উসকানিতে মূলতঃ দাঙ্গার তীব্রতা বেড়ে ওঠে। দাঙ্গার ফলশ্রুতি সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে ওঠে, যা তাদের সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নেতারা বেকার যুবকদের প্রলোভন দেখিয়ে দাঙ্গার আগুনে ঘি ঢালার চেষ্টা করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভদ্র বেকার ছেলেদেরও জীবন পরিবর্তিত করে সাধারণ মানুষের জীবনের পাশব প্রবৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে এই কাজ করেও মন থেকে তারা শান্তি পায় না। ভুরি ভুরি খুন করলেও মানবিকতাবোধ তারা হারায়নি -

''দশরথ ঃ কিস্যু বলা যায় না দাদা। মানুষের মন, ও বড়ো হারামি চিজ। তুমি ভাবো, আমরা মনে আনন্দ পাই ওদের মেরে? মানুষ মেরে আরাম আমি পাই না দাদা। ছুটে ছুটে যাই, খতম করি, আর দৌড়ে এসে ম্যাড সিন করে কাঁদি। আবার ঝটাকসে যাই -"

দেশভাগের পরিকল্পনা মুসলিম লিগ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে ১৯৪০ সালের ৩১ শে আগস্ট। তারও আগে থেকেই দ্বিজাতি তত্ত্বের হাওয়া দেশে বইতে থাকলেও কেউ এই বিষয়ে প্রতিবাদ করেনি।। তাই বলা যায়' ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। মুসলিম লিগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' এর ডাকে কলকাতার আগেই ১২ই মার্চ কানপুরে, ১লা জুলাই থেকে আমেদাবাদে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। এই সময়ে হিন্দুদের হিন্দু অঞ্চলে এবং মুসলমানদের মুসলিম অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে দেশভাগের পটভূমি তৈরী করা হয়। এ প্রসঙ্গে নাট্য অ্যাকাডেমি পত্রিকায় 'সাঁকো' নাটকটির আলোচনা করতে গিয়ে ঋত্বিক ঘটক মন্তব্য করেছেন -

''দাঙ্গা শুধু কলকাতা বা ঢাকাতেই হয়নি, দেশের বিভিন্ন শহরে হয়েছে, '৪৭ সালের আগে এবং পরে, বেশ কয়েকবার। এই সব দাঙ্গা থেকে জন্ম নেয় দুই নতুন সামাজিক শ্রেণী, রাজনৈতিক শক্তির আড়ালে কিছু দাঙ্গাবাজ এবং তাদের মদতপুষ্ট কিছু গুণ্ডা। ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠানের বছর তিনেকের মধ্যেই দানা বাঁধতে থাকে নানা সমস্যা, খাদ্যাভাব থেকে শুরু করে কর্মসংস্থানের সঙ্কট পর্যন্ত। স্বভাবত রাজনৈতিক কারণেই দাঙ্গার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে প্রয়োজন এখনও তার গরিমা হারায়নি।"

মহসিন ও রশিদ পূর্ব পাকিস্তান থেকে গান শুনতে এসে দাঙ্গার মধ্যে পড়ে যায়। রশিদকে রাস্তায় খুন হতে হয়। মহসিন প্রথমবার সাগর নামে একজনের জন্য প্রাণে বাঁচে এবং দ্বিতীয়বারও সাগর নামে আরেকজনের আশ্রয় পায়। ঢাকার অসহ্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখি সাগরের বোন মিলি। সাগর পত্রপাঠ ও নানান জায়গা থেকে খবরাখবর নিয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সম্পর্কে জানতে পারে। এই আশঙ্কায় সর্বদাই সাগরের মন কুঁকড়ে ওঠে -

''সাগর ঃ (চিঠি নামিয়ে) ঢাকার অবস্থা অসহ্য। মিলি একা আছে। প্রতি মুহূর্তে ভয়ে কুঁকড়ে আছে মেয়েটা । জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হলে পত্রপাঠ রওনা হতে বলেছে। জামাইবাবু হয়তো হোটেলে গিয়ে চিঠি পাবেন। মিলির মতো সাহসী মেয়ে এত ভয় পেয়েছে চৌধুরীদা, রাতে ওর ঘুম হয় না। কয়দিন থেকে শহরের এই অবস্থা হয়তো তাকে বাড়ি ছেড়ে যথাসর্বস্ব নিয়ে-তার ওপরে বাচ্চাটা। চৌধুরীদা!

চৌধুরী ঃ তুমি খেয়ে নাও গে যাও। পিত্তি পড়ে যাচ্চে, তার ওপর এইসব - কিছু না ভাই, তুমি খেয়ে নাও। আমি একবার পাড়ার ছেলেদের দিয়ে সার্চটা অর্গানাইজ করে এসে - ব্যাপার সত্যিই গুরুতর।

সাগর ঃ চৌধুরীদা, ঢাকা শহরের সমস্ত আশঙ্কা আমার বুকে চাপ হয়ে জমে আসছে।... মিলির কী হবে! হয়তো এতক্ষণে মিলি - ''

সাগর মহসিনকে নিজের কাছে আশ্রয় দিলেও নিজের বোন মিলির শোচনীয় অবস্থা দেখে রাগে, তীব্র ঘৃণায় দাঙ্গাবাজদের হাতে তুলে দেয়। তার আর্তস্বর বারবার আছড়ে পড়তে পড়তে কাঁপতে কাঁপতে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যায়। অমানবিক চেতনার উপর আশ্রয় করলেও সাগর নিজেই অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। বারবার তার কানে ভেসে উঠেছে - 'দরিয়ার কূল পাইলাম না।' কিন্তু এ নীচত্বের দরিয়া, যেখানে নৈতিকতার কোন মূল্যই নেই। সাগর হাতের চিঠিখানি মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে উঠেছে -

''সাগর ঃ মিলি। এতক্ষণ সে বেঁচে নেই নিশ্চয়ই। সাগর মহসিনকে মারেনি, মারতে পারে না। যে বলবে সে কথা, তাকে আমি খুন করব। আমি হিন্দু, হাজার -হাজার লাখ - লাখ হিন্দুর ওপর মুসলমানরা যে অত্যাচার বারবার করেছে, তার শোধ নিলাম।

রাজনৈতিক নেতারা যেমন দাঙ্গার আগুন তীব্র করেছে, সেই আগুনে পুড়ে তারা নিজেরাও ছাই হয়ে গেছে। বেকার যুবকদের হাতে তারা যে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, খুনি ও

গুণ্ডায় পরিণত করেছে, সেই পরিবর্তিত মানসিকতায় বেকার নেশাগ্রস্ত অস্ত্রধারী যুবকেরা সেই নেতাদেরই পরিবারের মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করেছে, চৌধুরীর মেয়ে রমা সেই শিকার হয়েছে ও দশরথ তাকে গলির মোড়ে হাত চেপে ধরে ছুরি দেখিয়ে শাসিয়েছে। সেই বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতি থেকে কেউ বাদ পড়ে নি -

চৌধুরী ঃ ''... বেরিয়েছি ওই দেশটাকে ধরার জন্য। এতদিন নেশা ভাং করে বেপাড়ায় পথচলতি মেয়ের গয়না খুলে নিত, কী প্রেম নিবেদন করত, এখন পাড়াতেও চালু করেছে। আর মরবি তো মর, আমাকে দিয়েই বউনি! ...''

চার বছর অনুশোচনার আগুনে পুড়ে শেষে সাগর সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে মহসিনের বাবা তসলিম মিঞা এবং মা ফুলজান বিবির কাছে ক্ষমা চাইবে। অবশেষে মুখোমুখিও হয় তাঁদের। সাগরের সাক্ষাত পেয়ে তাঁরা খুশি হন এই মনে করে যে তাঁদের ছেলের সংবাদ পাওয়ার আশায়। পূর্বে মহসিন একবার কলকাতায় গিয়ে দাঙ্গার মধ্যে পড়েছিল সেই সময় সাগর নামে এক যুবক তাকে রক্ষা করেছিল। তাই তার বাবা-মা ভাবেন এই সাগরই সেই সাগর।

তাই সাগর আপনভোলা মা ও ইতিহাসের শিক্ষক বাবার কাছে ছেলের মতো স্নেহের রসে স্নান করে এবং সমস্ত ঘটনাটাই তার কাছে কখনো একটা অসহ্য রসিকতা, কখনো স্বপ্নের ঘোরের মতো লাগে। আমরা অভিভূত হয়ে যাই মহসিনের মা যখন সাগরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে সেই দৃশ্য দেখে -

''মা ঃ খোকা!

সাগর ঃ (চম্‌কে) কে? ও!

মা ঃ (চারপাশ দেখে নিয়ে, হাতের বাটি আঁচল থেকে বের করে) একটু খাইয়া নে!

সাগর ঃ কী?

মা ঃ ঘন দুধের এট্টু সর।

সাগর ঃ সর খাব?

মা ঃ না! শহরে থাইকা থাইকা চেহারা হইছে য্যান কাঁকলাশের পারা, গেল? (উনি উঁচু হয়ে লম্বা সাগরের মুখে বাটিটা গুঁজে দেন। স্বল্প গবেটের মতো সাগর কোঁত কোঁত করে গেলে, উনি আঁচল দিয়ে

মুছিয়ে দেন।)...

হারে, কষ্ট যা পাওনের চুকাইয়া আইছি। দেশেও এখন বুঝি স্বস্তি আসে, আমার জীবনখান ভইরা আসে। ... জানিস কত বিভ্রান্তির মাঝ দিয়া দেশের মানুষগুলান পার হইতেছে, একটার পর একটা। এখন একটু নিশ্চিন্দি দরকার, শান্তি দরকার। ...এট্টা পদ শুনবি খোকা আমার?

সাগর ঃ বল।

মা ঃ নানান বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ ভুবন ভরমিয়া দেখি একই মায়ের পুত।"

সাগর মহসিনের বাবা-মায়ের কাছে তার আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে না পেরে বিবেকের কামড়ে ছটফট করেছে, গুমরে গুমরে মরেছে সত্য প্রকাশের ব্যর্থ প্রচেষ্টায়। হিন্দু মুসলমানের তফাত ভুলে সাগর একেবারে ভেতর থেকে বদলে গেছে, দেশের ঐতিহ্যকে ভালোবেসেছে। এবার সে জবার দিকে মুখ ফিরিয়েছে সত্য কথাটি বলবার উদ্দেশ্য নিয়ে -

"সাগর ঃ আমার ঘর থেকে মহসিন ধরা পড়ে। এক সাগর তাকে বাঁচায়, আর এক সাগর তাকে ধরিয়ে দেয়। আমি সেই সাগর।

জবা ঃ সাগর!

সাগর ঃ ভেবেছিলাম, আমি হিন্দু, একজন মুসলমানের ওপর শোধ নিয়েছি। ...আজ জানছি একজন বাঙালি, একজন মানুষ; আর একজন বাঙালি আর একজন মানুষকে অকারণে হত্যা করেছে। আমি পশু। ...চরে বসে বুঝলাম, কত বড় মিথ্যার চেতনা আমার জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে।"

জীবনটা বহতা নদী, তার চর জেগে ওঠে হঠাৎ, পলি পড়ে বহুকাল ধরে। কারণ, হঠাৎ একটা কাজের মধ্যে দিয়ে জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করা যায় না। ঠিক তেমনি সাগরের জীবনেও তাই ঘটেছিল। ইতিমধ্যেই যুক্তফ্রন্টের কর্মীরা সারা দেশময় গা-ঢাকা দিলে দেশে সামরিক আইন চালু হয়। বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে জবাকে বাড়ি ছাড়তে হয়। সাগর জবাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেও কোথায় যাবে ঠিক করে উঠতে পারে না। কলকাতা যাওয়ার প্রসঙ্গও ওঠে। কিন্তু সবশেষে দুজনেই বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। সে পথ কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার পথ নয়, এ পথ

হিন্দু-মুসলমানের লড়াই করে অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ। বড়ো অন্ধকার পথে যেতে যেতে উদাত্ত গলায় গান গায়, যেন সে গান প্রতি মানুষের মনের মণিকোঠায় গেঁথে যায়।-

''নাইয়া ভাই।

চক্রপথে ঘুইরা মোর মন রইল যে উদাস -
বাতাস তবু আভাসে দেয় নতুন ভোরের বাস।
... ব্যথায় আমার বুক যে ভাঙ্গে আশা ভাঙ্গে না।
সাথে আছে হাজার মানুষ, তুফান ডরি না।

হঠাৎ আকাশটাকে সাদা করে দিয়ে বিদ্যুৎ চাকুক হেনে গেল একবার। আকাশ জুড়ে গুর-গুরানি।... ওঁরা চমকে তাকান, কিন্তু গানটা শতকণ্ঠে ধরে নিয়েছে এখন কারা। শেষ কলিটা আছড়ে পড়তে থাকে জোয়ারের মতো মঞ্চময়। ... স্থানুর মতো দাড়িয়ে আছে চারটা মানুষ। খেজুর গাছটাকে আলুথালু করে দিয়ে ঝড়চা এসে পড়ছে।''
ঋত্বিক ঘটকের শ্রেষ্ঠ নাটকের তালিকায় 'দলিল' নাটকটি স্থান অধিকার করলেও 'সাঁকো' নাটকটি নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে মনে হয়। 'দলিল' নাটকে তিনি দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা ও অসহায় জনতার আন্দোলনের কথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু 'সাঁকো' নাটকে জনতার বৃহত্তর আন্দোলনে পথে নামবার সঙ্গে সঙ্গে তা মানবিকতার আর্দ্ররসে সিক্ত হয়েছে, তা চোখে পড়ার মতো। এই দিক দিয়ে 'দলিল' নাটক থেকে এই নাটকটি এক ধাপ এগিয়ে। সমালোচকের মন্তব্যের সাথে এই পর্যয়ের আলোচনা শেষ করতে চাই -

''প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঋত্বিকের সব নাটকেই দুটি জিনিসের ছায়াপাত ঘটেছে। এক, দেশবিভাগ জনিত হাহাকার; দুই, হারানো মাকে খুঁজে ফেরা।... ১৯৬৮ সালে অভিনয় দর্পণ পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখেছেন ঋত্বিক ঃ শরতের নির্মল আকাশ হাসিতেছেন! মা আসিতেছেন, আমাদের চিরকালের সেই দুর্গা, আমাদের মেয়ে বাঙ্গালীর প্রাণের বস্তু - তিনি আসিতেছেন। ... কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হইতেছে মা নাই। মা ছিলেন। কিন্তু সেই যুগ গত হইয়াছে। এখন চোঙ্গা প্যান্ট পরা কয়েকটি বালখিল্য বিকৃত উল্লাসে অভব্য আচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহাকে আপনারা বলেন দুর্গাপূজা। আমাদের শৈশবের সে স্মৃতি, তাহার সহিত আজকের এই অসহ্য কানফাটানো লাউড স্পীকারের আওয়াজ তক্ মেয়েদের মুখের লাল নীল রং - এ একদম মেলে না। মনে হয় অঙ্কে কোথাও একটা গরমিল হইয়াছে। আমাদের ধারণামত মনে হয় দেশ ভাগই ইহার মূল কারণ।'' ...
(সাঁকো থেকে দেখা - রথীন চক্রবর্তী, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা - ৫)

সহায়ক গ্রন্থ / তথ্যসূত্র / গ্রন্থপঞ্জীঃ

১) দলিল - ঋত্বিক ঘটক, উৎসর্গ পত্র, গণনাট্য নিউ মাসেস পাবলিকেশন।

২) Associated press of India, 16th July, 1947,বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন - তাপস ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ - ১৪১১, পৃষ্ঠা - ৩৭

৩) সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা ঃ আত্মজিজ্ঞাসা, দুই আধুনিক মাতৃমন্ত্রী সাম্যবাদী নাট্য শিল্পী, রণেশ দাশগুপ্ত; প্রবন্ধঃ স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও বাংলা রঙ্গমঞ্চ, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা - ৬,১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ২৭১

৪) সাঁকো - ঋত্বিক ঘটক, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা - ৬,১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ২৯০।

৫) প্রবন্ধঃ সাঁকো থেকে দেখা - রথীন চক্রবর্তী, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা - ৫, পৃষ্ঠা - ৩১২

সিভিল সোসাইটি, আধিপত্য ঃ ভারতীয় প্রেক্ষাপট

বিশ্বজিৎ বক্সী

[**বিষয়চুম্বক ঃ** এই প্রবন্ধে সিভিল সোসাইটির ধারণাটি রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সিভিল সোসাইটির অর্থ নির্মাণের পাশাপাশি এর উদ্ভব ও বিকাশের প্রেক্ষাপটটির রূপরেখা নির্মাণ করা হয়েছে। সিভিল সোসাইটির ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছে মূলত পশ্চিম ইউরোপে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতাকে বজায় রাখার জন্য এবং রাষ্ট্রশক্তির আধিপত্যের হাত থেকে ব্যক্তিমানুষকে রক্ষা করার তাগিদেই সিভিল সোসাইটির জন্ম এবং বিকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় অতিনিয়ন্ত্রণের পরিসর থেকে ব্যক্তিমানুষকে মুক্তি দিতে সিভিল সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। শাসক শ্রেণী সমাজে নিজ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য 'সিভিল সোসাইটি'কে ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সিভিল সোসাইটির রূপের যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই ভারতে সিভিল সোসাইটির রূপটি কিরূপ তা উল্লেখ করা হয়েছে।]

সাম্প্রতিক কালে ঘটমান বেশ কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির ধারণা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

শব্দগত ভাবে সিভিল সোসাইটি একটি ইংরাজি শব্দ। সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন বাংলা পরিভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন তাত্ত্বিক, লেখক, চিন্তাবিদ ইংরাজি শব্দ 'সিভিল সোসাইটি'র ভিন্ন ভিন্ন বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন নাগরিক সমাজ, জনসমাজ, পুর সমাজ, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সমাজ, পৌর সমাজ, ইত্যাদি। পরিভাষাগত এই জটিলতা থেকে মুক্ত হতে সরাসরি ইংরাজি পরিভাষাটি এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হল।

সিভিল সোসাইটির ধারণা প্রায় আড়াইশো বছরের পুরোনো। তবে তারও আগে Greek Civitas শব্দটি থেকে Civics এবং Citizen বা নাগরিক শব্দের উদ্ভব যা গ্রীক নগররাষ্ট্র বা polis গুলিতে দেখা যায়। যার থেকে আধুনিক অর্থে সিভিল সোসাইটি বা

নাগরিক সমাজের উদ্ভব হয়। সিভিল সোসাইটির ধারণার উদ্ভব ঘটে আঠারো শতকের শুরুতে মূলত পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে। কিন্তু সিভিল সোসাইটির ধারণার উদ্ভব পুরোনো হলেও সমাজবিজ্ঞানের জগতে এর চর্চা গুরুত্ব পেতে শুরু করে বিংশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে ইউরোপে। একদিকে উদারনৈতিক চিন্তাভাবনায় ও অন্যদিকে মার্কসীয় চিন্তাভাবনায় - রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের যে প্রতিরূপের আবির্ভাব ঘটে, তাতে সিভিল সোসাইটির ধারণাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু বিংশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে আধুনিক অর্থে civil society বা নাগরিক সমাজের উদ্ভব হয়। একদিকে উদারনৈতিক ভাবধারায় পুষ্ট জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবল আধিপত্য ও অন্যদিকে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের নেতিবাচক ক্রিয়াকলাপ সিভিল সোসাইটি আলোচনা চর্চার পরিমণ্ডলকে নতুন ভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে। বিংশ শতকের ৯০ এর দশকে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতন ঘটতে শুরু করলে সেখানকার সামাজিক সংগঠনের রূপ এবং এদের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের চরিত্রটি ঠিক কিরূপ হওয়া উচিত তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা শুরু হতে থাকে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে সিভিল সোসাইটির রূপটি নিয়ে চিন্তাবিদদের চিন্তাভাবনা শুরু হয়। আবার নয়া উদারনীতিবাদী ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, কোনও কোনও তাত্ত্বিক সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের পরিধিকে হ্রাস করে সিভিল সোসাইটির ধারণাটি পুনর্নির্মাণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আবার এরই পাশাপাশি মানবাধিকার আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন ও সংগঠনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সিভিল সোসাইটির চর্চাকে নতুনভাবে তুলে ধরতে থাকেন।

সিভিল সোসাইটির সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিক, চিন্তাবিদ, বিভিন্ন গোষ্ঠী, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্মাণ করায় সিভিল সোসাইটির ধারণাটিকে কেন্দ্র করে অস্পষ্টতা প্রকট হতে থাকে। এর ফলে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। তাই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সিভিল সোসাইটির যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ব্যক্ত হয়েছে, তার ভিত্তিতে বলা যায় সিভিল সোসাইটি ধারণাটির মূলে রয়েছে দুটি পূর্বানুমান। একটি হলো রাজনৈতিক আর অপরটি হলো সমাজতাত্ত্বিক। রাজনৈতিক দিক থেকে মূলত তিনটি ভাবনা থেকে সিভিল সোসাইটি উদ্ভবের প্রেক্ষাপট তৈরী হয় ক) নাগরিকদের মধ্যে সাম্যের ধারণা, খ) ব্যক্তিসত্তার অখণ্ডতার ধারণা এবং গ) বিশ্বাসের স্বাধীনতার ধারনা। আর সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে সিভিল সোসাইটি হল রাষ্ট্র ও পরিবারের মধ্যবর্তী একটি স্বাধীন সংঘবদ্ধ ক্ষেত্র। এই মধ্যবর্তী স্বাধীন সংঘবদ্ধ ক্ষেত্রটিতে ব্যক্তিমানুষ স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে থাকে। রাষ্ট্রীয় নেতিবাচক ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজ

ব্যক্তিসত্তাকে যেমন ব্যক্তিমানুষ স্বাধীনভাবে মেলে ধরতে পারে, তেমনি পরিবারের সংকীর্ণ পরিসর থেকে সে নিজ ব্যক্তিসত্তাকে বৃহত্তর পরিসরে মেলে ধরার মধ্য দিয়ে মুক্তির স্বাদ লাভ করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু যত সহজে রাষ্ট্র ও পরিবার নামক দুই ক্ষেত্রকে বিভাজন করা হয়, আদৌও বিভাজন রেখাটি ততটা সরলীকরণ নয়। কারণ এই দুই ক্ষেত্র একে অপরের সাথে জড়িত থাকে। যার ফলস্বরূপ সিভিল সোসাইটির ধারণাগত অসুবিধা সৃষ্টি হয়। অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় ব্যক্তির অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের এক্তিয়ার বহিঃর্ভূত পরিসর রূপে সিভিল সোসাইটি সমাজের বিন্যাস ও যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রেও সিভিল সোসাইটির ভূমিকা থাকে। যদিও এই ভূমিকা সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নাগরিক অধিকারের পটভূমিকায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পূববর্তী (মার্কসবাদ অনুসারে দাস - সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ) সমাজগুলিতে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনও সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা ছিল না। রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল সমার্থক ধারণা। মার্কস এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহারের প্রথম অধ্যায় প্রথম ছত্রে বলেছেন ''আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাঁদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।'' উৎপাদনের উপকরণগুলি যাদের হাতে থাকে তারা হল শাসক শ্রেণী। আর উৎপাদনের উপকরণগুলি থেকে যারা বঞ্চিত তারা শোষিত শ্রেণী রূপে পরিগণিত হয়। রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক থেকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শ্রেণীর হাতিয়ার। মার্কস উল্লেখ করেছেন শাসক শ্রেণী শাসিত শ্রেণীর উপর তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যবহার করে। কিন্তু বলপ্রয়োগের যন্ত্রের অবিরাম ব্যবহার শাসক শ্রেণীর দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে। আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবশ্য বলপ্রয়োগই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, বরং জনসম্মতি অর্জনের প্রক্রিয়াটিও এর কাছে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বজনীন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ নগন্য হয়ে দেখা দেয়। কারণ আধুনিক রাষ্ট্র জনসম্মতি অর্জনের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করে। এবং শাসক তথা আধিপত্যকামী শ্রেণীকে জনভিত্তির উপর স্থান অর্জন করার পথ সুগম করে তুলেছে।

ইতালীয় চিন্তাবিদ আনতোনিও গ্রামশি আধুনিক ইউরোপীয় ব্যবস্থার এই নতুন ভূমিকাকে সুস্পষ্টভাবে সূত্রায়িত করেছেন। তাঁর ধারণা অনুসারে রাষ্ট্র = আধিপত্য (Hegemony) + প্রভুত্ব (Domination)। রাষ্ট্র = সিভিল সোসাইটি + রাজনৈতিক সমাজ। অর্থাৎ রাষ্ট্র হল সম্মতি (সিভিল সোসাইটি / আধিপত্য) ও বল প্রয়োগের (রাজনৈতিক সমাজ / প্রভুত্ব) এক জটিল সমাহার। শাসক শ্রেণী সিভিল সোসাইটির

মধ্য দিয়ে সম্মতি অর্জনের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ওপর আধিপত্য স্থাপন করে। গ্রামশীর বক্তব্য অনুসারে সিভিল সোসাইটির কোন বিশেষ রূপ বা বিষয়বস্তুর কারণ হল শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রেণী সংগ্রামের ফলাফলই ঠিক করে দেয় কোন সামাজিক গোষ্ঠী আধিপত্যকারী হবে। আধিপত্য বলতে বোঝায় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত নেতৃত্ব স্থাপনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্থাপিত একটি সম্পর্ক বিশেষ। এই আধিপত্য স্থাপনের প্রক্রিয়াটি কার্যকরী হয়ে ওঠে সিভিল সোসাইটির মধ্য দিয়ে। সিভিল সোসাইটি হল পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণী সমূহ ও সামাজিক শক্তি সমূহের মধ্যকার এক জটিল সম্পর্কের জাল এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান গুলির সামগ্রিকতা। যেখানে পুঁজিপতিরা আধিপত্যকারী শ্রেণী সেখানকার সিভিল সোসাইটি হল পুঁজিবাদী সমাজ। এমন সমাজে যে সাংবিধানিক অধিকার, সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি দেখা যায় তা পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক সুসজ্জিত থাকে। পুঁজিপতি শ্রেণী তথা শাসক শ্রেণী সমগ্র সমাজের উপর আধিপত্য স্থাপন করে বৌদ্ধিক ও নৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। শাসক শ্রেণীকে এই আধিপত্য স্থাপনের জন্য একদিকে যেমন বুদ্ধিজীবিদের আদর্শগত দিক থেকে জয় করতে হয়, তেমনি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাদের নিজস্ব 'বুদ্ধিজীবীদের'। এই 'বুদ্ধিজীবীরা' শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

ইউরোপে সিভিল সোসাইটির উদ্ভব ঘটে পুঁজিবাদের বিকাশের প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু ভারতে স্বাধীনতার প্রায় শুরু থেকেই স্বাধীন পুঁজির বিকাশ Mixed economy র দরুন অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে সিভিল সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা তেমন ভাবে অনুভূত হয়নি। গ্রামশির চিন্তায় আধিপত্য ও সিভিল সোসাইটির ধারণা ছিল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পুঁজিবাদী শ্রেণী ক্ষমতা দখলের পর সিভিল সোসাইটি পুঁজিবাদী শাসনের বৈধতা প্রদানকারী মাধ্যমরূপে জনগণের ওপর আধিপত্য স্থাপনের হাতিয়ার হিসাবে পরিণতি পায়। অর্থাৎ বলা যায় ইউরোপে সিভিল সোসাইটি তাই পুঁজিবাদী শাসকদের প্রাণস্বরূপ। ভারত রাষ্ট্র প্রভুত্ব স্থাপনের পাশাপাশি যে আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া চালায় সেক্ষেত্রে ভারতে সিভিল সোসাইটি থাকলেও তার প্রতিরূপটি ইউরোপীয় সিভিল সোসাইটির থেকে ভিন্নতর। ইউরোপে ব্যক্তি মানুষ তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে সিভিল সোসাইটি নামক পরিসরটিকে সযত্নে লালন পালন করে আসছে। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এখনও পর্যন্ত জনগণ 'নাগরিক' পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে, ব্যক্তিমানুষের পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ফলস্বরূপ ভারতীয় জনগণ তাদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশের ক্ষেত্র হিসাবে সিভিল সোসাইটিকে গণ্য করে না। মাঝে মধ্যে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমাজের এক্তিয়ার বহির্ভূত ভাবে নাগরিকদের সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করতে দেখা গেলেও ভারতে সিভিল সোসাইটির পরিণত রূপটি

আজও অধরা।

ভারতের নাগরিক জনগণ সিভিল সোসাইটির পাশ্চাত্য প্রতিরূপের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুললেও এটা ভাবা ঠিক হবে না যে ভারতে সিভিল সোসাইটির বিকাশ হয়েছে। কারণ ভারতীয় নাগরিকরা সম্প্রদায়গত জীবনকেই অগ্রাধিকার দেয়। পরম্পরাগত ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক আস্থা, ধর্মীয় আচার আচরণ, পরম্পরাগত মূল্যবোধ গুরুত্ব পায়। আধুনিক ভারতে সংঘ, সমিতিগুলির মধ্যে ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাস, আরোপিত মর্যাদা পবিত্রতা অপবিত্রতার ধারণা নাগরিক জীবনে খুব সহজেই স্থান করে নেয়। কিন্তু এগুলিই 'নাগরিক মানুষের' স্বাধীন 'ব্যক্তি মানুষ' হয়ে ওঠার পথে অন্যতম অন্তরায়। ফলস্বরূপ ব্যক্তিমানুষ তার স্বাধীন সত্তার বিকাশের প্রয়োজনের পরিবর্তে ঐসব সামাজিক সংঘ, সমিতির সদস্য হিসাবেই থাকতে আগ্রহবোধ করে।

গ্রামশিকে অনুসরণ করে বলা যায় ইউরোপে সিভিল সোসাইটি গড়ে তুলতে এবং তাকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী আধিপত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু ভারতে এই ঐতিহাসিক উপাদানটি ভীষণভাবে অনুপস্থিত। অধিকার সমন্বিত ব্যক্তিমানুষ অপর ব্যক্তি মানুষের সাথে এবং রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে এই সমগ্র ধারণাটিই আজ ভারতে গড়ে ওঠেনি। কারণ উপনিবেশিক উৎস থেকে পাওয়া 'আধুনিকতা' ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আধিপত্যকারীরা এবং প্রতিষ্ঠানগুলি এমন এক আধুনিকতার প্রায়োগিক ভাষ্য রচনা করেছে যা স্বাধীনভাবে বোধগম্যহীন। মেকি 'আধুনিকতা' আজ ভারতে সর্বত্র বিরাজমান। প্রকৃত আধুনিক মনস্কতার অভাব সাধারণ জনগণকে সিভিল সোসাইটির অংশ থেকে বঞ্চিত করেছে। ফলে স্বাধীনতার রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠানিক অধিকারের কাঠামোতে আবদ্ধ নাগরিকদের নিয়ে কোনও সুসমন্বিত সিভিল সোসাইটি আজও ভারতে গড়ে ওঠেনি। আবার সিভিল সোসাইটি নিয়ে যে ক্ষীণ আলোচনা গড়ে উঠতে দেখা যায় বা যাচ্ছে তা রাষ্ট্র নির্দেশিত যৌক্তিকতার পরিসর থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এর ফলস্বরূপ ভারতে সিভিল সোসাটির ধারণা বাস্তবায়িত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ঃ

১) রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি ঃ সম্পাদনা সত্যব্রত চক্রবর্তী, একুশে প্রকাশনা, কলকাতা ২০০২।

২) মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা -ঃ শোভনলাল দত্তগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ১৯৮৪

৩) ‘রাষ্ট্র ইউরোপ ও তৃতীয় বিশ্ব’ঃ প্রবন্ধকার শিবাজী প্রতিম বসু , গ্রথিত -- রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতিঃ সম্পাদনা সত্যব্রত চক্রবর্তী, একুশে প্রকাশনা, কলকাতা ২০০২।
৪) আনতোনিও গ্রামশিঃ বিচার বিশ্লেষণ। প্রথম খণ্ড - শোভনলাল দত্তগুপ্ত সম্পাদিত, পার্ল পাবলিসার্স, কলকাতা ১৯৮৩।
৫) গ্রামশির চিন্তা ঃ প্রবন্ধকার সুশোভন সরকার, গ্রথিত - গ্রামশির জীবন ও চিন্তা, সম্পাদনা নরহরি কবিরাজ, র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, কলকাতা - ১৯৯৬
৬) আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার এবং সুশীল সমাজ ঃ সমীর কুমার দাস, নান্দীগ্রুপ, কলকাতা নভেম্বর, ২০০২

মন্দির গাত্রে রামায়ণ

ডালিয়া হাজরা

বিষয় চুম্বক ঃ আমাদের বাংলার গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পোড়া মাটির মন্দির। সপ্তদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে এই মন্দির গুলি নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দির গুলির যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আমরা পাই তা অসাধারণ। বাংলার মন্দির শিল্পীরা যে সৌন্দর্য সুষমার অবদান মন্দির গুলিতে রেখে গেছেন তা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের (১৪৮৬-১৫৩৩) পর বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময়ে অর্থাৎ ষষ্ঠ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের শুরুতে বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা, পৌরাণিক দেবদেবীর লীলার কথকতা রামায়ণ গান, মহাভারত কথা, মঙ্গল কাব্যের পালাগানের জনপ্রিয়তা বাঙালি মানসে আনে এক ধর্মোদ্দীপনা। এ সময়ে তুর্কী শাসনের শেষ পর্যায়। মুঘল রাজশক্তির অভ্যুদয় বাঙালির স্বাধীন চিন্তায় স্থাপত্য চর্চায় এক উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনার সৃষ্টি করল।[১] এই নবযুগে পোড়া-মাটির মন্দির গুলিতে রামায়ণ, মহাভারত পৌরাণিক কাহিনী, বিভিন্ন দেবদেবীর উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয়গুলির টেরাকোটা ফলক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মন্দির গাত্রে সমস্ত ভাস্কর্য রূপায়ণে বাংলার মন্দির শিল্পীদের অসামান্য কারিগরি নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, শুধু তাই নয় মন্দির সজ্জার ক্ষেত্রে শিল্পীদের অবাধ স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্য। এই দুই মহাকাব্যের কাহিনী বা উপাখ্যানগুলির মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জীবন দর্শনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। দুই হাজার বছর ব্যাপী সময় কাল ধরে রামায়ণ ও মহাভারতের সমগ্র ভারতবর্ষের ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত মতবাদ ও ন্যায়পরায়ণতার যুক্তি, বিচারবোধ, মননশীলতাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে এসেছে। একই সঙ্গে ভারতবর্ষের সাহিত্য ও শিল্পের সমগ্র ভাণ্ডারকে অতি মাত্রায় সমৃদ্ধ করে তুলেছে।[২] সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই রামায়ণের

প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় শিল্পকলাকেও রামায়ণের কাহিনী বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতীয় শিল্পে অসাধারণ সৃজনশীলতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে ছিল রামায়ণের কাহিনী। সম্ভবত গুপ্ত যুগ থেকে ভারতীয় শিল্পে রাম কাহিনীর রূপান্তর ঘটানো শুরু হয়েছে। সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে বাংলায় যে পোড়ামাটির মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল সেই মন্দিরগুলিতে রামায়ণ কাহিনীর চিত্ররূপের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলার পোড়ামাটির মন্দিরগুলির অলংকরণ সজ্জায় রামায়ণের কাহিনীর যে ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় তা ভারতবর্ষের আর কোথাও লক্ষ্য করা যায় নি। বাংলাতে এমন কোনো পোড়ামাটির মন্দির নেই যেখানে রামায়ণ কাহিনীর চিত্ররূপ নেই।

বাংলার পোড়ামাটির মন্দিরগুলিতে রামায়ণের চিত্ররূপ যে পরিমাণে লক্ষ্য করা গেছে, সেই পরিমাণে মহাভারতের কাহিনীর ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর চিত্ররূপ লক্ষ্য করা যায়নি। তবে বাংলার মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ রামায়ণ কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে বাংলার মাটিতে কবি কৃত্তিবাসের অমর সৃষ্টি রামায়ণ কাহিনী শুধু বাঙালি জীবনকেই প্রভাবিত করেনি, বাংলার মন্দির শিল্পীদের কাছেও তার জনপ্রিয়তা যে একান্ত ভাবেই স্বীকৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ মন্দির দেওয়ালে কেবল মাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ কাহিনীর অলংকরণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ একদিকে যেমন বাঙালি মনে প্রভাব বিস্তার করেছে, অন্যদিকে চৈতন্য প্রবর্তিত নব বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার হিসাবে কল্পিত হয়েছেন।ঁ কৃত্তিবাসের সৃষ্ট রামচন্দ্র হলেন সুদৃঢ় চরিত্রের একজন আদর্শ পুরুষ। অশুভ শক্তির বিরোধিতা এবং নৈতিক সদগুণ সবই তাঁর চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে সীতাকে আদর্শ মানবী রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ রামায়ণের কাহিনীকে নিজেদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিল। রামচন্দ্রের কর্তব্যনিষ্ঠা, নৈতিক গুণাবলি সাধারণ মানুষকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া ও গুপ্তিপাড়ার মন্দির, মুর্শিদাবাদের বড় নগরের গঙ্গেশ্বর শিবমন্দির ও জোড়বাংলা মন্দিরের দেওয়ালে অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রামায়ণের বিভিন্ন জনপ্রিয় ঘটনা। রাজা দশরথের রানিদের পুত্রলাভের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি যে হোমযজ্ঞের আয়োজন করে ছিলেন তার চিত্ররূপ দেখতে পাই। আবার কোথাও দেখা যায় রাম-লক্ষণ মুনিদের যজ্ঞ ভঙ্গকারী দৈত্য বধে নিযুক্ত হয়েছেন অর্থাৎ রাম-লক্ষণ এখানে দুষ্টের দমনে উদ্যত হয়েছেন। গঙ্গেশ্বর শিবমন্দিরে মুনি বিশ্বামিত্রকে দেখা যায় - তাড়কা রাক্ষসী বধের জন্য রাজা দশরথ যাতে রাম-লক্ষণকে প্রেরণ করেন তার জন্য বিশ্বামিত্র অনুরোধ জানাচ্ছেন। রামচন্দ্র কর্তৃক অহল্যার শাপমোচনের চিত্র ও

লক্ষ্য করা যায়। হরধনু ভঙ্গরত রাম, রামসীতার বিবাহ দৃশ্য প্রভৃতি জনপ্রিয় ঘটনাও খোদাই করা হয়েছে মন্দিরগুলিতে। মন্থরা কর্তৃক কৈকেয়ীকে মন্ত্রণা দান, রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠানোয় দশরথ শয্যাগত, বিদায়ক্ষণে ভরত ও রাম অলিঙ্গনাবদ্ধ প্রভৃতি দৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে পঞ্চবটি বনে রাম-লক্ষণ কর্তৃক শূর্পনাখার নাসিকাচ্ছেদন প্রভৃতি দৃশ্য ও খোদাই করা হয়েছে মন্দিরগুলিতে।

এছাড়া হাওড়া জেলার সুলতানপুর, মেল্লক ও মহিষামুড়ির মন্দির, হুগলির দশঘরার মন্দির বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির, বীরভূমের কয়েকটি মন্দির এবং মেদিনীপুরের কয়েকটি মন্দিরের দেওয়ালে রামায়ণের বিভিন্ন জনপ্রিয় ঘটনার অসাধারণ চিত্ররূপ লক্ষ্য করা যায়। রাম কর্তৃক মারীচ বধ, রাবণের পঞ্চবটি বনে আগমন, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, লঙ্কায় রাবণের রাক্ষসদের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ। হনুমানের লঙ্কা দহনের দৃশ্য, সমুদ্রে সেতু নির্মাণ, অশোকবনে সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ, লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতা প্রভৃতি ঘটনার চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উল্লিখিত মন্দিরগুলিতে।

আমাদের বাংলার পোড়ামাটির মন্দিরে এই রকম অসংখ্য রামায়ণ কাহিনীর চিত্ররূপ লক্ষ্য করা যায়, আলোচ্য মন্দিরগুলি ছাড়াও আরও অনেক মন্দিরে রামায়ণ কাহিনীর চিত্ররূপ লক্ষ্যিত হয়। রামায়ণের কাহিনী সাধারণ মানুষের জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। মন্দির শিল্পীরাও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মন্দির শিল্পীরা রামায়ণের কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মন্দির গাত্রে রামায়ণের কাহিনীর অসাধারণ চিত্ররূপ ঘটিয়েছিলেন। মন্দির গাত্রে রামায়ণ কাহিনীর যে চিত্ররূপ মন্দির শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) প্রণব রায়- বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, মেদিনীপুর, ১৯৯৯

২) নীহার ঘোষ- বাংলার মন্দির শিল্পশৈলী (অন্ত মধ্যযুগ) অমর ভারতী, কলকাতা, ২০১২

৩) তারাপদ সাঁতরা- মন্দিরে রামায়ণ কাহিনী, পুনর্মুদ্রিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মাঘ ১৪১৯

৪) শীলা বসু, অভ্র বসু - বাংলার টেরাকোটা মন্দির কলকাতা, আনন্দ প্রকাশনা, ২০১৫

৫) তারাপদ সাঁতরা- কলকাতার মন্দির - মসজিদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০২
৬) মঞ্জু হালদার - প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা ২০১৩
৭) হিতেশ রঞ্জন সান্যাল - বাংলার মন্দির কারিগর, কালকাতা ২০১২
৮) তারাপদ সাঁতরা - পশ্চিম বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য ঃ মন্দির ও মসজিদ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমী, কালকাতা, ১৯৯৮
৯) David. J. Mccution - Late Mediaval Temples of Bengal, (Calcutta 1993 Rpr.) 6

Negation or Absence: An Ontological and Epistemological Approach from the Viewpoint of Indian and Western philosophy

Dr. Aditi Bhattacharya

Abstract: In this essay my purpose is to explore the epistemological and ontological significance of negation or absence in Nyaya and Mimamsa darshan on the one hand and Jean Paul Sartre's Existential philosophy on the other. One may wonder why this sort of strange attempt has been made on my part? Both Nyaya and Mimamsa schools are known as logical schools of Indian Philosophy who try to establish their viewpoints by following strict and stringent logic; whereas Existential philosophical outlook is completely opposite. Existential thinkers and Sartre is not an exception, want to present their viewpoints mostly by appealing to the affective aspects of human nature. Their slogan is: Man is no less an affective/active being than he is a rational agent. In spite of having completely different outlook in their approaches to philosophical problems as well as belonging to opposite schools of thoughts there is an underlying tune of unity in their thoughts regarding the ontological and epistemological significance of negation.

I

The famous Bengali poet Bishnu Dey wrote in one of his poems: 'But emptiness is not emptiness' ('shunyo tabu shunyo noi'). The inherent truth which the above mentioned line of the poem reveals is the fact that emptiness or negation is not sheer negation; it is embedded with positivity. The philosophical intellect of both East and West captures this truth and hence the problem of negation plays a very significant role in philosophy. I would like to approach 'negation' or 'absence' both ontologically and epistemologically in the light of Indian and Western Philosophy. My purpose is to find out if there is any point of similarity in their approaches. As for Indian side of approach I have taken Nyaya-Vaisesika and Mimamsa School and for Western side of approach I would like to discuss the Existentialism of Jean Paul Sartre.

The Nyaya Vaisesika School admits 'Abhaba' as a separate category or padartha and thus accepts the ontological status of negation in their philosophy. As a realistic school, Nyaya holds that the experience of the 'absence' of a thing is as real as the experience of its 'presence'. Professor Bimal krishna Matilal, in his article '**Navya-Nyaya: Technical Developments in the New School since 1300 AD'** has pointed out that Navya Nyaya speaks of two types of negation—absence and difference. Professor Matilal has discussed in detail the logical implications of these two types of negation in the total context of determining the character of Logic in India. As my purpose is different I do not want to go into the logical jargon of Navya Nyaya view about negation. I shall try to find out the ontological significance of the two types of negation as pointed out by Naiyaikas.

The Naiyaikas point out one may either negate the location or occurrence of a property in a locus or may negate the identity between two things. In the first case, we actually ascribe the 'absence' of a property in a locus. As for example, when we say 'there is no pot on the ground' we deny the existence of the pot on the ground—here the 'ground' is the locus where the pot is absent. Hence 'absence' means 'A is not in B'. This sort of 'abhaba' is described by the Naiyaikas as 'Samsargabhaba'. On the other hand, one may negate the identity between two things. As for example, when we say 'cow is not man' we actually deny the identity between 'cow' and 'man'—'cow' lacks the essence of 'man' as cow is different from man. Thus 'difference' means 'A is not B'. The Naiyaikas describe this sort of 'abhaba' as 'Anonyabhaba'. This difference between two things signifies 'absence of property of one thing in the other', as in the above case, 'the absence of manness in cow'.

According to the Nyaya-Vaisesikas, all non-fictitious (real) properties have their locus in the world. The fictitious properties like, sky-lotus or son of a barren woman, do not have their locus in this world; they may have their existence in other possible worlds. We can negate only those properties which have their locus in this world (whose presence range is non-empty) and by negating them we get a negative property called 'absence'. The Naiyaikas believe that fictitious properties cannot be negated as their presence range is empty. Here the realistic stand of the Naiyaikas is quite evident. For the Naiyaikas, absence or a negation of a property is as much real as its presence—it has its place or location somewhere in the world.

'Absence' has different kind of reality other than 'presence' but it is real among other real entities which constitute our world. The 'absence' as an item of reality always designates 'something' that exists as 'protiyogin' of absence. The place, where 'absence' as a kind of reality is located, is described by the Naiyaikas 'adhikarana' or 'anuyogin' of absence. When we say 'the pot is absent on the ground' we admit that the absence of pot is different from ground and has the reality of its own—both the ground or 'adhikarana' and the 'absence of the pot' have real status in the world of ours.

Let us look at the ontological status of 'negation' in Mimamsa School. The Prabhakara Mimamsakas do not admit the ontological reality of the 'absence' or 'abhaba', though they uphold that the fact of the usages of negative statements cannot be denied. According to the Prabhakaras absence is nothing but the 'bare' place 'Kevela adhikarana' where it is located. When it is said that 'the pot is not on the ground' we can very well account for this negative usages by the 'bare ground' without postulating the existence of any real entity like 'absence of pot'. The interesting thing is: the Prabhakaras do not say that the substitute of the 'abhaba of pot' is 'the place', but the 'bare place'. This implies that the place is not without qualification, but qualified by the absence of the pot which the Prabhakaras deny to admit. The Bhatta Mimamsakas, another school of the Mimamsakas, on the other hand, admit the ontological reality of negation or absence. They uphold that we cannot deny the existence of negation as we encounter negation in this world of ours. And in this sense their status is rather close to their philosophical antagonists, the Naiyayikas, rather than to the Prabhakaras who belong to the same philosophical fold. But the Bhattas disagree with the Naiyayikas regarding the way negation can be cognized.

Now we will discuss the epistemological status of negation or absence both in the philosophy of Nyaya and Mimamsa School. How do we know negation? The Naiyaikas opine that negation or abhava can be cognized by the same instrument by which we cognize the presence of a thing. They point out both positive and negative properties can be known by perception, though they admit that a special kind of contact (sannikarsa) is needed for the perception of absence or abhaba. When we perceive something our eyes come in contact with the object of our perception. For the perception of abhaba, we require special type of contact and that is

named by the Naiyaikas as 'Visesana-Visesya bhava sannikarsa' (relation of character- and-characterized). The Naiyayikas claim that in our perception of the absence of the pot on the ground the non-existence of the pot is connected with the eye by the relation of 'character- and- characterized' and the characterized ground is conjoined with the eye. Thus in our perceptual judgment 'there is no pot on the ground' the non-existence of pot is adjectival to the ground; 'ghatabhava vishista bhutala'--- 'the ground is characterized by the absence of the pot'. We can also observe the negation of the pot as a 'visesya' or noun. As for example, we may say 'bhutale ghatabhaba'--- 'there is absence of pot in the ground'.

The Prabhakaras, as we have already noted, do not admit the separate ontological status of abhaba so they account for the epistemological usage of the negative statements like 'the pot is not on the ground' by the perception of 'bare ground'. The Naiyaikas has raised objection against this view by pointing out that the perception of the 'bare ground' is nothing but the 'nature' of the ground itself. The perception of the difference between 'bare ground' and 'ground' can be intelligible only if we postulate the reality of 'abhaba'. But the prabhakaras decline to accept this point. The dispute between the Naiyaikas and the Bhattas regarding the cognition of abhaba is well known in the history of Indian Philosophy. The Bhattas hold that abhaba cannot be known by the same pramanas by which bhaba padarthas can be known. They point out we cannot cognize abhaba by perception. In order to cognize abhaba the Bhattas admit a separate pramana, called 'anupalabdhi' or 'non-perception'. This view of the Bhattas is shared by the Vedantins who also opine that abhaba can be cognized by anupalabdhi. According to Bhattas and Vedantins when all conditions of the perception of the pot are present, and yet the pot is not perceived, in that case anupalabdhi or non-perception would lead to the true cognition of the absence of pot. In our cognition of the absence of pot on the ground all the conditions of perception, like, sufficient light, the visionary organ etc. are present except the contact between eye and the pot because here the pot is absent. The Bhattas demand that in case of the cognition of the 'absence of the pot' anupalabdhi or non-perception is the 'extraordinary cause' whereas the perception is the 'ordinary cause'. The Naiyaikas, on the other hand, point out that the thing is other way round. When we apprehend the 'absence of the pot on the ground' our perception acts as the 'extra-ordinary cause' and non-perception acts as

the 'ordinary cause'. Moreover, the Naiyaikas argue that anupaladhi or non-perception is nothing but 'absence of perception'—hence there is no need to speak of non-perception as a separate means of cognition for the knowledge of absence or abhaba.

II

Now we can turn our eyes to the Western approach of the problem of negation. I have already mentioned in the beginning of my article that I would like to approach the problem from the Existentialist philosophy of Jean Paul Sartre. In the Existentialist Philosophy, especially in the philosophy of Sartre, the problem of negation plays a very important role. Sartre, in his famous book '**The Psychology of Imagination**' points out that the negation or absence of an object can be apprehended by the imaginative faculty of the mind. In imagination human consciousness posits a 'hypothesis of unreality'—here consciousness, in relation to the whole of reality, is able to form and posit objects characterizing by a certain trait of nothingness. Sartre holds that like perception imagination also posits an object but it does not posit an existing object. Imagination posits its object in four different ways--- it does posit its object either as 'non-existent', or as 'absent', or as 'existing elsewhere' or 'it does not posit its object as existing'. In all these four cases our positional act is negative. When I imagine a friend of mine who is not present here and now before me, my consciousness surely posits an object who can otherwise be seen, touched or heard by me if I did sensorily experience him; but here I am conscious of the fact that he who can be so sensorily experienced by me is not being actually experienced by me. Here I intuit my friend because I immediately apprehend him in my imagination yet I do not intuit him as present, but as absent. Imagination, actually in Sartre's language, is not 'non-intuitive' but 'intuitive-absent'.

Sartre points out that objects of imagination are completely different from the objects of perception. In perception we posit an object positively which exists for the perceiver at a definite point of time, while in imagination we undoubtedly posit an object but we posit it negatively. Here it is to be noted that by pointing out this distinction Sartre has given a blow to the belief of David Hume who declares that images (objects of imagination) are mere faint representations of the sensations and the objects of the image are in the image. Sartre has criticized this belief of

Hume by calling it 'an illusion of immanence' and has shown that both in perception and imagination the object exists outside my consciousness; here the phenomenological stand of Sartre is evident. From the phenomenological point of view consciousness is object-oriented whether it is perceptual or imaginative consciousness and the object exists 'out-there', i.e. outside consciousness. The only difference that exists between perceptual and imaginative consciousness is that in perception my consciousness does encounter the object as existing but when I imagine I encounter the object as absent or non-existent.

From the above discussion it is evident that Sartre has accepted the ontological reality of negative entities. He accepts the fact that in our world of reality there are both positive and negative entities—the 'absence' of Peter is as 'real' to me as his 'presence'. And here his stand is comparable to the stand of Naiyayikas and Bhattas. The Naiyaikas think, as has already been discussed by me, we can negate only the non-fictitious properties which have their locus in this world of ours. But here Sartre differs from the Naiyaikas, he thinks that we can as well negate the so-called fictitious properties. As Sartre upholds that it is by the faculty of imagination we posit the absence of an entity, he has the freedom to include both the non-fictitious and the fictitious entity in his ontology. Imaginative consciousness posits its object as non-existing or as absent; hence I can posit the 'absence' of my friend Peter (who is/was present somewhere in the real world) as well as the 'non-existence' of the centaur (which is in the fictitious world) in my imagination.

Here it is to be noted that for the cognition of absence or negation Sartre has spoken of a faculty which has not been accepted as a cognitive faculty in Indian philosophy. Imagination cannot be a 'prasidha pramana' from the point of view of Indian Philosophy .It is thought that imagination or 'Kalpana' is something which destroys the purity of knowledge or Prama. All schools of Indian Philosophy share the same view. In classical Western philosophy also the faculty of imagination has not been recognized as true cognitive faculty. 'Experience' and 'reason' are, according to them two main cognitive faculties and 'intuitive' faculty has been accepted as the highest faculty of mind. Intuition is something 'beyond reason' --- it surpasses reason by accepting the limitation of reason as a faculty of cognition. It is Hume who first recognizes the role of the faculty of 'imagination in our knowledge but his view of imagination as 'faint

representation' of perception does not impart any separate epistemological value to imaginative faculty. Kant speaks of 'imagination' as the highest faculty of mind but here imagination is equivalent to intuition.

In contemporary Western Philosophy, especially in Existential Philosophy a special emphasis has been given on imagination as a separate cognitive faculty .Psychological analysis has shown us that there are three faculties of the mind---thinking, feeling and willing and thinking faculty has so far been emphasized by the philosophers as the cognitive faculty. It is the credit of the existentialists to point out the important role of the faculty of feeling in our knowledge situation and by this they have expanded our cognitive field. Soren Kierkegaard, the famous Existentialist thinker, has repeatedly shown when reason fails how we take resort to feeling as one of our necessary instrument of knowledge. Imagination, as a faculty of feeling, plays a very important role in Sartre's philosophy and he accepts it as a cognitive faculty through which we apprehend non-existing or absent things. In this point Sartre's viewpoint differs from the Nyaiaikas as well as from the Bhatta Mimamsakas. Sartre points out that neither perception nor non-perception can make us aware of the non-existence or absence of anything, imagination alone can help us in this respect. In '**Being and Nothingness'** Sartre points out our perception is strictly related to the given. Perceiving consciousness can in no way go beyond the given materials; it cannot transcend the stern reality. In imagination alone our consciousness goes beyond the limits of the given materials. It is marked by spontaneity—it is through and through active and creative. As the positional act of imagination is negative it can posit the non-existent things of this world and all other possible worlds.

Let us see how Sartre would explain the cognition of the negative fact 'the pot is not on the ground'. Sartre would say non-existence or absence of pot on the ground cannot be perceived as perception can posit only the positive entity. Our perceptual experience cannot identify the difference between 'the ground where there is no pot' and the 'ground' itself---for our perceptual experience both phenomena are identical. The imaginative consciousness, Sartre would point out, can alone capture the said difference. The person, who searches for the pot and imagines/expects it to be there in the definite place on the ground, alone, can encounter 'the absence of the pot' as an ontological reality. Naiyaikas, as we have seen,

have criticized the Prabhakaras by saying that 'bareness of the ground' (bare of the pot) cannot be intelligible unless we admit the objectivity of 'the absence of pot'. Sartre would definitely agree with the Naiyaikas regarding this point. But he would say that this 'absence of pot on the ground' can be encountered only by the faculty of imagination—in perception we encounter the ground only but our imaginative faculty reveals before us that the pot which we expected to be on the ground is not existing there. Sartre would want to emphasize the fact that the cognition of non-existent or absent object (in this case absence of pot on the ground) is a conditioned cognition, conditioned by the imagination/ expectation of the person who seeks for the object (pot) in a particular place (ground) at a particular point of time. I think Naiyaikas, as realist, had similar thought in their mind when they accepted the objectivity of the absence of pot and made a difference between 'ground' and 'ground qualified with the absence of ground'; though they did not recognize an alternative faculty of the mind for the cognition of the phenomenon of 'absence or negation.' Here I would like to point out that the Yoga school of Indian philosophy has spoken of 'vikalpa britti' for cognizing abhaba or negation. Like Prabhakaras the Yoga philosophers uphold that abhaba is 'adhikaranswarup', i.e. identical with its locus but they hold that through our 'vikalpa britti' we feel or intend the absence of the thing in the locus. As for example, when we say 'Purusha (Absolute Being) is characterized by absence of being born', we feel that there is a character- characterized (dharma-dharmibhaba) relation between Purusha and absence of being born. Here we want to intend that the character of being born is absent in Purusha. Similarly when we say 'the pot is not on the ground' what we want to intend is that the ground is characterized by absence of pot. It is through our vikalpa britti the absence of pot is revealed to us. Thus the Yoga philosophers also want to make a difference between the 'bare ground' and 'the ground characterized by the absence of pot' which we cognize through vikalpa britti.

On the basis of the above discussion we perceive that both in the Nyaya and Existential philosophy of Sartre the ontological significance of the 'presence' of a thing becomes meaningful only against the background of its possible 'absence' or 'negation'. 'The pot is on the ground' is ontologically significant as there is every possibility of its not being on the ground. Epistemologically also one cannot deny the significance of the

cognition of 'non-being' or 'absence' of a thing—whenever one encounters the absence of a thing on its locus one becomes aware of the difference between the locus qualified with the 'presence' of the thing and the locus qualified with the 'absence' of the thing. But disagreement among them starts, as we have already seen, regarding the cognition of negation. The stringent logical atmosphere of Indian philosophical thought does not allow the Realist Naiyaika to accept any tool of cognition other than the 'prasiddha pramanas' and he has to stick to perceptual faculty for cognizing negation. It seems to me that in this respect the traditional Rationalists and Empiricist Western thinkers would agree with the Nyaya School rather than with the Existentialist approach. But the novelty of the Existentialist approach lies in devising a separate tool for cognizing negation -- in order to posit/ cognize negation we need some cognizing tool different from perception. When I look for Peter in the Library and discover his absence there what I actually perceive is 'the particular chair and table where Peter likes to seat'. Peter's absence is a reality to me who imagines or expects him to be there--- hence in relation to my imaginative consciousness his absence is revealed to me. As we are used to believe that the thinking part of our mind plays vital role in the process of cognition it becomes difficult for us to accept other possibilities. Sartre has shown us an alternative way and here lays his uniqueness.

References:

1. **Takasamgraha**: Annambhatta, Bengali Translation by Narayanchandra Goswami, Published by Sanskrita Pustak Bhandar,2nd edition, 1983.
2. **Explorations in Philosophy (Indian Philosophy): Essays by J.N.Mohanty:** Edited by Bina Gupta, Oxford University Press, 2001.
3. **Classical Indian Philosophy:** J.N.Mohanty, Oxford University Press, 2002.
4. **The Character of Logic In India:** Bimalkrishna Matilal, edited by Jonardon Ganeri and Heeraman Tiwari, Oxford University Press, 1998.
5. **Being and Nothingness**: Jean Paul Sartre, London, Methuen publication, 1957.
6. **The Psychology of the Imagination**: Jean Paul Sartre, London, Rider, 1949.

Translating Imagination: The Poetics of Transnational Geo-politics in Amitav Ghosh's novel *The Hungry Tide*

Debolina Byaborto

'The word 'translation' comes, etymologically, from the Latin for 'bearing across'. Having been borne across the world, we are translated men. It is normally supposed that something always gets lost in translation; I cling to the notion that something can also be gained'.

(Rushdie, *Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-1991:* http://philosophy.ucsc.edu/new-events/colloquia-conferences/Rushdie 1992 Imaginary Homelands. pdf)

The poetics of nation in keeping with the notion of being a sacrosanct entity conforms to the politics of difference. The articulation of such difference in the context of the operative principles of politically informed social institutions necessitate in the legitimization of certain abstract constructs like human identity, issues related to partition of lands, drive towards the concretization of cultural root and so forth. This very drive towards concretization of the chain of abstract emotive significations eventually leads to the weaving of a thread in the form of national belonging along with its indispensable tie up with a 'community'. But the fixed 'objective reality' that the virtual meaning of community claims for, persists with the pluralistic discourse involving the subjective imagination(s) of the individuals who belong to the same. The question of imagination not only brings into consideration the matter of belongingness but also takes into account the questions of culture, institutional religion, constitutional law and its violation , language and so forth that used to translate ones nationalistic imagination, conception of root, historical experience, customs and so forth.

Because for Benedict Anderson as he records in *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, 'nationality , or, as one might prefer to put it in view of that word's multiple significations, nation-ness, as well as nationalism, are cultural artefacts of a particular kind' (Anderson 4). Thus human identity placed in the geo-political cartography becomes a point of pluralistic discourse, a question of looked-at-ness and above all a matter of subjective interpretation based on the fact of interdependence or relativity. Therefore, this national belongingness as an inseparable part of 'nationalism' / 'nationalistic discourse' owing to its empirical nature becomes a subject of study that includes human individuals as objects of representation in the same. Benedict Anderson in his *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* asserts that ' historical reach' and ' theoretical power' of the subject of nationalism itself being theorised through the stylish narrative(s) of the authors through the ages claims for the involvement of the stream of culture studies in it. Anderson asserts such prolonged theorization ' has developed an extraordinary proliferation of historical, literary , anthropological, sociological, feminist, and other studies linking the objects of these fields of enquiry to nationalism and nation' (Anderson xii).

Therefore such inclusion/exclusion drive inherent in the very practice of nationalism in order to be geographically sound incorporates the technical measurement of the cartography of 'nation' in the forms of what Anderson calls 'Census, Map and Museum' and so forth (Anderson xiv). This geographical mapping in the orientalist world runs in keeping with simultaneity with the suggested standard of the 'undisturbed' ' Eurocentric parochialism' that stands as the godfather to the grammar of the nationalism having its belonging to the colonised world. And as the historical record suggests, the articulation of such familiarities of separation in the nineteenth century engenders a dialectical reading of the stand of an individual in respect to its geo-cultural and political

'other'. What remains politically correct, however, is the consequent transaction of nationalist imagination with politically charged suppression of the individuals who live through them. This prolonged and repetitive act of suppression not only strangles the voice announcing individuality but also sends into oblivion at times the whole narrative tradition of communities that according to Anderson 'are to be distinguished not by the falsity/ genuineness, but by the style in which they are imagined' and its inhabitants who used to define itself through the same (Anderson 6). The narrative tradition thus becomes the objectified antique 'real' yet to be acknowledged in the supposedly universal cum occidental mode of standardization leading the living state of a community to an objectified invisible and inferior reality. In this way 'nation' which in Anderson's words is an 'artefact entangled with emotional legitimacy' tends to exist in the constructed verbal definition given by the nationalist theorists who again remain 'perplexed' by certain societal 'paradoxes'. Anderson sums up :

(1) The objective modernity to the historian's eye vs. their subjective antiquity in the eyes of nationalists. (2) The formal universality of nationality as a socio-cultural concept-in the modern world everywhere can, should, will 'have' a nationality, as he or she 'has' a gender- vs. the irremediable particularity of its concrete manifestations, such that, by definition, 'Greek' nationality is sui generis. (3) The 'political' power of nationalisms vs. their philosophical poverty and even incoherence (Anderson 5).

Therefore the perplexity emerging from the underlying paradoxes inherent in the very concept of 'nationalism' necessitates in the fiery propagation of certain nationalist thinkers as great Hobbes, Tocquevilles, Marx, or Webers which according to Anderson , nationalist discourses among as many isms lack. This very lack in reality forms an essential vulnerability a 'neurosis' at the very juncture of the translation of nationalist imagination of the individual into suitable narrative discourse(s). Being caught in the

vortex of what Anderson calls 'political ideology' and 'cultural system' one particular community exists as the Conradian 'heart of darkness' or as a utopian dream dreamt by a historical materialist along with its narrative(s) written by the unknown and virtually illiterate 'other' waiting for the merciful and subjective reading of the culturally sound theorists.

The fictional narratives of Amitav Ghosh are punctuated by such issues related to the discourse of 'nationalism'. They are often marked with journeys, visits and human movements across time and space. Being informed by the cultural matrix and political perplexity related to the discourses of nationalism, the characters that people the fictional reconstructs of Ghosh along with their respective cultural and political consciousness happen to live and uphold the emotive practices lingering with the langue of the 'imagined community' i.e. the nation. But the author's tireless journey through disparate geographical locales makes him able to use his imagination with precision. His habit of delving deep into history helps in the construction of his hybrid narrative to hold a vision of the unified character of the world. His writingsattempts to highlight the negative aspects of nationalism and nation-states, their artificial and imagined nature especially in contemporary times, and focuses towards a *priory* indivisible character of the world. This is precisely in this context that Amitav Ghosh's *The Hungry Tide* as a translated artefact of his romantic imagination in the form of the fictional reconstruct becomes a documentation of the discursive dichotomy of the East-West theme. The metanarrative of the novel runs through the stream of the narrative of a utopian dream consisting of the tidy peripheral landscape of the tiny island, its labyrinthine waterways i.e. Sundarbans and the congenital written narratives of a few emotionally unsound stories of the people who happen to spend their lives either by catching fish, counting every singlemovements of the crabs or by competing with the arrogant waterways. The novel thus becomes a spectacle of what John C. Howle suggests in his book *Amitav Ghosh: An*

Introduction, 'vexing nature of national borders' (Hawley 131). He goes on to point out '…just as the natural tides of the area tend to obliterate the sense of permanent division between land and sea, Ghosh's characters gradually learn to recognise the transient nature of the divisions between individuals of 'whatever class' (Hawley 132). The 'precarious existence' as Sarika Prasad Auradkar in his book *Amitav Ghosh: A Critical Study* suggests, the villages seek sustenance from the congenial wiped out borders of the land and the sea that promises to erase the constitutional borders among nations or humans irrespective of class , caste, culture , gender and so forth. Its geographical setting suggests Hywel Dix in his article

' 'You and Your Stories!' : Narrating the Histories of the Dispossessed in Amitav Ghosh's *The Hungry Tide* and Salman *Rushdie's Midnight's Children'* ', 'It is in fact a zone of several different kinds of interaction, a zone of contact between different cultural, national, ethnic, linguistic and religious communities' (Dix 127). The survival strategy of the residents and the eco-critico-logical environmental balance of the geographical space remain dynamic and interdependent with respect to the invented tradition of the land itself keeping a vow to provide the civilizational 'self' with the spectacle of a modern world. As Ghosh records :

'In our legends it is said that the goddess Ganga's descent from the heavens would have split the earth had Lord Shiva not tamed her torrent by tying it into his locks. To hear this story is to see the river in a certain way' : as a heavenly braid , for instance, an immense rope of water, unfurling through a wide and thirsty plain' (Ghosh 6) .

Amid the great traditions formed by the dynamism of rivers grand and great, benevolent and holy, the fictional landscape of Ghosh happens to find the islanders to inhabit his fictional narrative tradition. The residence of the islanders is identified as the trailing traders of the nation's fabric, the unglamorous ragged fringe of her sari, the *anchol*that follows her half wetted by the sea. The swirl of water penetrates into the long stretches of the land and carries the

natural whisper and the rumours of the land and the forest that it nourishes on its own lap. Thus the body politic of the landscape is fabricated by the underlying confluence between land and water that the inhabitants used to call in the name of ' *Mohona*', a seductive word, 'wrapped in many layers of beguilement' (Ghosh 6-7). The land with its seemingly beguiling appearance as a geographical entry unpacks its eco-critical beauty that in a way becomes a part and parcel of the process of what Anderson calls 'invention of tradition' invented by the very wilderness, flapping waves of water and by the very essence that leaves the island on its own as a land without history. Ghosh thus records the oft sounding :

'...the "Sundarban", which names " the beautiful forest ". There are some who believe the word to be driven from the name of common species of mangrove – the *sundari*tree, *Heriteria minor*. But the word's origin is easier to account for than is its present prevalence, for in the record books of the Mughal emperors this region is not named in reference to a tree but to a tide- *bhati.* And to the inhabitants of the islands this land is known as *bhatirdesh*- the tide country except that *bhati* is not just the tide in particular, the ebb – tide, the *bhata* . This is a land half submerged at high tide : it is only in falling that the water gives birth to the forest. To look upon this strange parturition, mid-waved by the moon, is to know why the name "tide country" is not just right but necessary ' (Ghosh 8).

So far as the significance of the name is concerned this land of necessity forms its grand narrative, an epic for its own description under the spell of which people used to live. This epic is formed not merely by invention but by the power of internalised faith in the abstract belief that eventually becomes the religious ideology as a way of living life. This umbrella of epic originates from the ritualistic practice of holding and propagating belief in the epic of 'Bon Bibi' 'the goddess of the forest' and further as Ghosh records in 'these parts, people believe she rules over all the animals of the jungle " (Ghosh 28). For this 'crocodiles and other animals do her bidding'

(Ghosh 102). Therefore, the village people although reside at the far distance from the syncopated paws of constructed buildings or from the affect of simultaneity or 'apprehension of time' appropriated by the print capitalism in the forms of newspaper and the like remain able to construct the 'shrine' of Bon Bibi ' outside the houses here' (Ghosh 102). The shrine of Bon Bibi stands as what Anderson calls the ' symbols of nationalism' in contrast to the ingredients of ' modern culture of nationalism' in the figure of 'cenotaphs and tombs of Unknown Soldiers' (Anderson 9). Even the meta-theatrical performance arranged by the villagers at the cost of their golden time of arranging their sustenance by accumulating themselves together in large number waiting open-eyed with spellbinding expectation for the performance of the mythical tradition at times qualifies the great tradition of the metropolitan imagination of nation. So hypnotic is their faith in the myth of Bon Bibi that even sometimes it pressurises a materialist teacher cum social activist like Nirmal sailing on board in the month of mid-January towards a geographical entry called Garjontola to take a part in the ritualistic practice of paying homage to the shrine of Bon Bibi, once established by a simple girl like Kusum's father. His curious journey towards the religious belief of others which for him is a mere 'false consciousness'(Ghosh 222) in a way becomes the formative process of the transformation of his conception to a poetic faith in the some black weird animal or at the 'glimpse of a small, triangular fin' of it as the messenger of Bon Bibi (Ghosh 235). And hence is the learned materialist's defeat as a representative of the collective body of the society in front of the simple and spiritual belief of the girl, Kusum from the western island of Bengal. The matter of fact is such spiritual belief that persists among the villagers as the undisturbed faith carries a note of hybrid religiosity. Because the manifestation of the myth of the demon King and Bon Bibi that the muse of the *bhatirdesh* as ' the saviour of the weak and a mother of mercy to the poor' (Ghosh 104) reflects has its root or background in the world of Arabia and holds strong Islamic influence. Ghosh records:

The setting was Medina, one of the holiest in Islam; here lived a man called Ibrahim, a childless but pious Muslim who led the austere life of a Sufi *faqir*. Through the intervention of the archangel Gabriel, Ibrahim became the father of blessed twins, Bon Bibi and Shah Jangoli. When the twins came of age , the arch angel brought them word that they had been chosen for a divine mission : they were to travel from Arabia to 'the country of eighteen tides' – *atherobhatirdesh* - in order to make it fit for human habitation. Thus charged, Bon Bibi and SahJongoli set off for the mangrove forests of Bengal dressed in the simple robes of Sufi Mendicants (Ghosh 103).

Thus the law giver of the tide country who punishes the personified abstractions like Dhona and saves helpless victims like Dukhey rings with religious hybridity. This religious hybridity eventually forms a religious community in the BhatirDesh where the song of invocation of the goddess of mercy reverberates with the hymenal *azan*, the Muslim call to prayer' (Ghosh 103). Such hybrid hymnal symphony in Anderson's terms as medium of 'religious imagining' becomes an inseparable part of the 'nationalistic imagining' of the island (Anderson 9). Thus the performative of the myth and its harmless propagation in the 'country of eighteen tides' stand as threat to the barbed wires of difference that the institutional religion as one of the dominant practices of nationalist discourse suggests to keep (Ghosh 103). Thus the socio-cultural boundary, political soundness , economical preserve have been put into question in a domain where the boundary of differentiation gets blurred by the whirls of water amidst the tiny and tidy archipelago.

Amidst such domain of blurred region the traveller self of Kanai Dutt a forty-two-year professional translator as representative of the modern world with all the preoccupations of the does and don'ts of civilization enters with the job of excavating a meta-discourse recorded by a liberal humanist. Heading towards Canning at the summons of his aunt the very first appearance of lively Kanai along with 'a wheeled airline bag with a telescope handle' standing with an air of quiet certainty , an indication of a well-grounded belief in

his ability to prevail, in most circumstances' accentuates his stance of being an 'outsider' against the very setting (Ghosh 4). His 'metropolitan affluence and middle-aged propensity' get reflected through his instrumental sunglasses , corduroy trousers and suede shoes' and so forth that perhaps do not go with the cosmopolitan setting that he heads towards. His primary interaction with Piya as a stranger in the train compartment displays his compartmentalised polished etiquettes and reflects his attempt to behave 'well' with the Indo-American gestures of the feminine entry of Piyali Roy who roams around him. Having internalised the feeling of being an 'other' his alienated self seeks for a comrade. Therefore an effortless note of invitation on his part towards Piya comes out, 'Come. I'm inviting you. Your company will lighten the burden of my exile' (Ghosh 13). His very mimicking pronunciation i.e. 'saar' as the villagers used to address his uncle Nirmal owing to his professional identity of being a school teacher hat Kanai refers to while talking about him in front of Piya in a way refers to his preserved snobbery towards the unpolished accents of the dwellers. His outlandish attitude therefore appears as a mere continuation of the one that he used to practise during his childhood days with the belief of being wise even than that of his teachers. And the consequent punishment that he receives in the mode of being rusticated to this tide country becomes a mere antique experience for him and nothing else. This preserved snobbery of the standardised world of New Delhi that organizes his intellect makes him an expert from his very childhood days in forming this imagination towards the land of the 'other'. And therefore during his primary visit to Canning he expresses his wonderstruck attitude towards enquiring about the possibility of the existence of a good number of people in the land. Therefore, his unhesitating exclamation thrown at Nirmal emerges 'But there are so many people here!' Here in this regard the defensive expression of Nirmal and the respective conversation between the two, flashes light on the imagination of the supposed 'self' regarding a nation of the other which always already gets

punctuated by the colourful stories that attempt to transform the discourse of demarcation in to reality. Here the gesture of Kanai shows affinity with the occidental notion 'of exploring the non-European world' with the intention of widening the boundary of the horizon of Europe (Anderson 13). Here in this regard his arrival in the tide country is in a way a strategy of widening the horizon of his experience by reading a country so far unexplored. Ghosh records the questions of Kanai:

Nirmal had smiled in surprise: What did you expect? A jungle?

'Yes'

It's only in films, you know, that jungles are empty of people. Here there are places that are as crowded as any Kolkata bazaar. And on some of the rivers you'll find more boats than there are trucks on the Grand Tank Road (Ganga 17).

Kanai's occasional flashback to the events of 1970, be it his boasting gestures to prove himself as a polyglot or that act of stumbling against Nirmal at College Street and the consequent cordial exchange with him while having the display of 'the translation of Francois Bernier's Travels in the Mughal Empire rather display the evidence of his arrogance announcing the power of his strong memory than making any remarkable transformation in the narrative that he gives vent to (Ghosh 18). Here in this regard the simultaneity of past becomes 'homogenous empty time' in the words of Anderson, being measured by clock and calendar (Anderson 24). This is perhaps this spell of memory that makes him give though a constricted response to the heartiest cry of Nilima, his aunt, through the medium of telephone from Goshaba, a village near Lusybari of course far away from the 'flat in New Delhi's Chittaranjan Park' where Kanai used to reside at (Ghosh 18). However, the cordial cry, Kanai re? (Ghosh 18) made on the part of persistent and childless Nilima for whom Kanai exists as 'her closest relative' (Ghosh 19) makes him keep himself ignorant from the call of his root no more. And it is under the spell of such repetitive

insistence to excavate the written narrative by Nirmal and not the mere emotional cry that insists him make 'arrangement' to spend a few days in 'exile' by putting aside somehow his growing attachment with the Odissi dancer . In the comparative study of bonds between the two, the case of the Odissi dancer proves to be a priority for which he can beg of 'for a month or of two' time span to put aside the call. Ghosh records such in-between uncomfortable feelings thus, 'To interrupt the natural trajectory of that relationship would have been a considerable sacrifice and he was glad he was not going to be that test (Ghosh 21). Such excuse comes in his way very naturally as:

Kanai was the founder and chief executive of a small but thriving business. He ran a bureau of translators and interpreters that specialized in serving the expatriate communities of New Delhi: foreign diplomats, aid workers, charitable organization in the city, the services of Kanai's agency were hugely in demand. This meant its employees were all over-worked – none so than Kanai himself" (Ghosh 20). This is perhaps his professional dealings with foreign diplomats and experts that determine his narrative with the tinges of modern nationalism where the undeniable heartiest cry like Nilima's 'Kanai-re' survives although with the faint appeal in the traveller's thought and feeling. It is his bold professionalism punctuated by all those formal outpourings that make him introduce Nilima in front of his contacts that cause the very impossibility for him to turn the request made on the part of her. And his unselfconscious self introduces Nilima as a figure 'who had made great sacrifice in the public interest , as a figure who was thrown back to an earlier era when people of means and education were less narrow, less selfish than now' (Ghosh 21). This is perhaps the fear of having tinges of uncompromising characteristics that used to haunt his narrative. The sound professionalism and his craze for exoticism that make him gaze at Piyali Roy during the train ride with special reference to her short hair and the like reflecting the image of Indo-American girl whose parents now reside in Seattle and she herself a research scholar pursues with her research

endeavour on marine mammals i.e. 'dolphin and such like' come to the fore. (Ghosh 22). Therefore unhesitatingly he identifies her to be 'an interesting woman' (Ghosh 22). And more specifically the glamour of her very presence remains undisturbed in his eyes as he takes her to be 'An American' (Ghosh 22).

But the thick wrapper of modern world sometimes gets hampered by the very nostalgia that peeps through. And under the spell of this he makes honest confession of his way through Canning as it makes him recollect the flapping wings of the bird that still attracts his imaginary garden which he still remains unable to deny. It is memory alone that provides Kanai with the fertile ground with the possibility to roll up the Geographical map as the launch that he boards with his aunt Nilima reaches Lusibari. The romantic fantasia he pines for:

The tide was running low when the Trust's launch brought Kanai and Nilima to Lusibari and this seem to augment the height of the tall embankment that ringed the land: from the water nothing could be seen of what lay on the far sides. But on climbing the earth Kanai found himself looking down on Lusibary village and suddenly it was as if his memory had rolled out as a map so that the whole island lay spread out before his eyes (Ghosh 36)

Such rolling mat of memory reminds him of the school and more specifically of the verandas established in 1938 ie. Sir Daniel Hamilton School or that of the lanes with the bustling aroma of *Jilipies* and so forth. Such nostalgia in reality reverberates with the nostalgic cry of Tham'ma in Amitav Ghosh's The *Shadow Lines* and her search for the undivided lanes of Dhaka or that of Kana Babu's shop that used to remind her of the undivided memory of her 'home'. She asserts ' But where's Dhaka? Or where's Kana-babu's shop?' (Ghosh 206). Even then so powerful proves to be the myth of Bon Bibi that Kanai draws a comparison between the shows displayed at the Academy of Fine Arts or that of cinema halls like Globe that used to quench the thirst of entertainment of the inhabitants of the civil society. In a way the spectacle of such rustic

carnival of 'tiger-goddess' (Ghosh 102) that chooses its setting 'in a city in Arabia' and the 'backdrop' being 'painted with mosques and minarets' (Ghosh 103) instead of displaying the setting of the very beginning of the dramatic performance either 'in the heavens or on the banks of the Ganges' like the mythological tales' (Ghosh 102) keeps him wonderstruck and happens to have a take on the intellectual string of his thoughtful mind. And this is perhaps the very unfamiliarity related to the setting that keeps on lingering with his mental landscape and provides him with the impetus of rethinking the narrative of the rustic woman, i.e. Fakir's wife Moyna in the urbanised sympathetic manner. Therefore his primary gaze at Moyna as personified rustic sensuousness with her 'dark and silky' complexion, 'her raven black hair shone with oil' emphasized by the 'kajol spilled over the rims of her eyes' get comparatively insignificant one in front of her amazing professional skill performing her duty as a trained nurse in the hospital at Lusibari. The very possibility of her articulate performance and at the same time her tenacity of keeping the identity of being the illiterate Fokir's wife being thoroughly a talented woman make him think of the possibility of the changed worldview of the inhabitants of Lusibari. Therefore the organizing principle of his narrative sums up the way his memory and experience are reconsidered through the arena of reconciliation:

It was astonishing to think of how much had changed in the tide country since his last visit, not just in matters but even in people's hopes and desires. Nothing was better proof of this than the very existence of this hospital and the opportunities it provided and aspirations it matured. This made it seem all the more unfortunate that someone with Moyna's talents should be held back by a husband who could not keep step (Ghosh 134).

This is perhaps this point of departure of imagination that makes him leave the letter to Piya before his physical departure to Delhi unpacking his desire punctuated by memory to give the final touch

to the incomplete narrative of his own.

The narrative of the political activist that in keeping with the underlying latent structure of Tagore's nationalism dreams of reconstructing the utopian 'nation' by reading out and bringing to the fore the ungeared voice(s) of the nation-state or by unpacking the fractures of the governing principle of the dominant in the civilization. His revolutionary politics against the governing principles of 'nation' doesn't stand of what Anderson says as symbol of the mere 'absent occupants' to feel up the void of lifeless tombs with 'ghostly nationalistic imaginings' (Anderson 9). Rather 'political ideology' and the 'cultural system ' that the journalistic narrative of Nirmal unpacks through the objective reading of the journal by Kanai that establish him as the active soldier of a socialist state. The foregrounding of the history of the supposedly outlaws that Nirmal's journalistic poetics promises to establish is as Hywel Dix suggests in his article ' ' You and Your Stories!' : Narrating the Histories of the Dispossessed in AmitavGhoh's*The Hungry Tide* and Salman Rushdie's *Midnight's Children'* as 'non-dialogic' as it happens to record the non-stereotypical narratives of Kusum and Fokir the consequences of the storm of Morichjhapi and the subsequent changes that draw on the very geo-politico-cultural landscape of his time. The initial revelation of the matter of his 'notebook , a *khata* , of the kind generally used by school children' directly refers to place of his concern i.e. 'of : an island on the southern edge of the tide country , a place called Morichjhapi ' (Ghosh 67). And thereby he unhesitatingly confesses the significance and purpose of his writing to Kusum , a friend of Kanai whom he once met in Lusibari. He records:

I have gone on at too great a length. Hours that have passed, the ink in my ballpoint pen is running down. This is what happens when you have not written for years: every moment takes on a stratling clarity; small things become the world in microcosm. (Ghosh 101)

Kusum and Horen have left me here with Fokir. They gone to find out

if the rumours are true; if Morichapi is to be attacked, and if so, when the assault will come . To think of all the years when I had nothing but time and yet wrote not one word . And now, like some misplaced, misgenderedScherherzade, I am trying to save right off with a flying, fleeting pen (Ghosh 148).

This is precisely the chief motif that runs through the narrative of 'saar' Nirmal as the guiding principle of his utopian dream being someone as Ghosh says, 'a poet at heart' a school teacher by profession and a political activist by passion. His imagination of the nation exists far away from the barbed wires of boundaries that attempt to separate humans owing to culture, religion, language, and so forth takes vow to breed under the poetic symphony of Rilke or with factual historical stream of Francois Bernier's Travels in the Mughal Empire. Hence his poetics of the nation happens to find a close affinity with that of the otherwise dream of the colonialist S'Daniel to 'build a new society, a new kind of country' (Ghosh 52). The socialist state that S'Daniel naturally finds affinity with the materialist design of Nirmal's one who thinks of constructing the residence 'where men and women could be farmers in the morning , poets in the afternoon and carpenters in the evening' (Ghosh 53).

This is the poetic self of Nirmal in particular that breeds within him the drive of humanism and stems a sense of revolutionary spirit surrounding his imagination of the nation. Therefore the scenario of floating people after partition from Bangladesh to this 'tide country island' and the very process of transformation from being a conservation place for the tigers to the temporary refuge for the dispossessed serves as a formative influence in the construction of Nirmal's activist's self to a revolutionary figure to the very core. And the very system as has been undertaken by the government in replacing them to Dandakaranya , deep in the forest of Madhya Pradesh, hundreds of kilometers from Bengal in the names of 'resettlement' that in reality proves to be more like the concentration camp, or like a prison for them further accentuates

the pathetic plight of the 'Dalits' or 'Harijans' as members of the group (Ghosh 118). The consequent trauma and their common demand for a 'little land to settle on' includes the drive of revolutionary Nirmal to mingle or rather raise his voice in the persisting revolution against the government. The drive also makes the transformation in the fundamental flavour of his character turning him to an enemy from being a husband. As Nirmal talks about his contemporary articulate character 'I really don't know. He became a stranger to me that year. He wouldn't talk to me. He would hide things. It was as if I had become his enemy' (Ghosh 119). This is perhaps this romanticised sacrificial commitment to the wellbeing of people that leads him to the route of being a macrocosmic figure than being bound up thoroughly a figure of the microcosmic world. Therefore eventually this idea of revolution becomes 'the secret god that rules' his 'heart' among others. It is his humanistic Faith that places him in the domain of blurred region to conceive the dream of not of the Platonic real but of turning a utopian like that of S'Daniel into reality. This sustenance provides him with the impetus of making a bold announcement among those disposed at Kumirmari amidst the storm of nature and further amidst the anarchy of the dialectics of the dominator/dominated he leaves the message of a bold soldier of a nation 'I'll teach them to dream' (Ghosh 173). This very idealistic confession of the wish of such historical materialist and the follower of the German poet Rainer Maria Rilke, comes to the fore as in the vein alike desires to live and act with the internalised idea of 'life' 'lived in transformation' . This is perhaps the reason behind his own transformation as an individual to walk in the trajectory of his life being a mentor, an activist, a socialist, a husband, a materialist to a philanthropist and above all a 'martyr'.

In contrast to the fascinating vision of Nirmal , Nilima Bose the founder of the Badabon Trust an 'organization widely cited as a model for NGOs working in rural India' used to hold a realistic vision of a society that runs in keeping with the consent of power i.e. the government (Ghosh 19). Therefore the continuous criticism that

Nilima used to throw towards the articulate gesture of her husband ends up keeping them miles apart virtually that makes Nilima feel as if they are living under the same roof more like 'ghosts' . She confesses , 'we were like two ghosts living in the same house' (Ghosh 120). And hence is the transformation of their living heaven Lusibari to a domain where his familiar husband appears to her as if a 'stranger' owing to the socio-political stand that necessitates his active part in the flood of anxiety in the geographical scenario of the island. This is perhaps this sharp contrast to that of the productive imagination of Nirmal, in the very conception of the 'greater good' or rather her subjective consideration of her preserved contradictory essence that makes her refuse Kusum as one among the plenty of the wretched hands to accept any help from her side. Ghosh's fictional record thus exposes the firm refusal of Nilima Bose and her expression of showing her concern for the security of the hospital founded by her for the greater good of people:

She told her that she would have liked to help, but it was impossible. The government had made it known that they would stop at nothing to evict the settlers: anyone suspected of helping them was sure to get into trouble. Nilima had the hospital and Union to think of: she could not afford to alienate the government. She had to consider to greater good (Ghosh 122).

Her very consideration of this greater good marks an inevitable border in her own vision to differentiate people in terms of necessity.

The seventy-six year old Nilima Bose whose practised dynamism in the field of social work attempts to hide the grey complexion of her literal existence and thereby her vision wrapped under the garb of the 'still more dark' complexion of her 'head' instead of her face like the 'waxing moon' preserves the firm persistence to get her jobs done (Ghosh 21). But the matter of fact is such continued effort made on the part of Nilima proves to be fruitless duringthe moments of her confrontation with memory. Because her preserved

contradictory essence towards the revolutionary credo of her husband's practised socialism proves to be a slice of her weakness while facing memory. Therefore while having a discussion with Kanai regarding her reluctance to unravel the packet that wraps up the journal of Kanai, Nilima says, 'When you get to my age, Kanai… you'll see it's easy to deal with reminders of loved ones who've moved on and left you behind' (Ghosh 23). Even the reminder of the 'rise of Matla' proves to be matter of what Ghosh says as 'the greatest sorrow , moments of joy recalled in wretchedness' . Her wretchedness, being caused by the mixture of her memory and her desire of lingering with the activities of her activist husband requests Kanai to have an objective reading through the sojourn of Nirmal as recorded in the journal. And further the reminder of the refusal she once made in front of the wretched Kusum who 'died in the massacre at Morichjhapi' now heightens her unease and perhaps her guilt-consciousness for which records Ghosh , 'She covered her face with hands. I am tired now; I think I'd better rest for a while" (Ghosh 122). Here again the horizon of differentiation for Nilima Bose in particular gets blurred in the end as it happens with Mrs. Dina Dalal living in a self-constructed heaven of her own together with two tailors Ishvar and his nephew Om transcending the barriers of caste , religion or economic status.

The narrative of Piya being the daughter of the immigrant parents now residing at Seattle is foregrounded with the inherent confusion because her research endeavour draws her to the domain of culture that she is quite unfamiliar with. Therefore her feeling of being caught in the vortex of the dialectics of culture gets accentuated thoroughly in her every Single turn. Her very first and partial interaction with Kanai in the train compartment displays her desperate attempt to establish her geo-cultural identity as different form the domain that she is supposed to enter. Thus she appears to Kanai as an original foreigner as Ghosh notes:

It occurred to him suddenly that perhaps, despite her silver nose-

stud and the tint of her skin, she was not Indian, except by descent. And the moment the thought occurred him, he was convinced of it: she was a foreigner, it was stamped in her posture, in the way she stood, balancing on her heels like fly weight boxer, with her feet planted apart (Ghosh 3).

Thus her androgynous outlook placed at Dhakuria station preserves the air of essential exoticism in her gesture. This very air of sophistication weaves the fascination of an individual like Kanai for the unknown. Her gestures of showing sympathetic legacy of finding affinity with the rustic 'earthenware cup' filled with milky, 'over-boiled' 'chai' is typical of a foreigner. Her very air of exoticism is conveyed in such a way that it even makes Kanai's spontaneous admission of the utter helplessness of the orientalists to bow down infront of the grateful apologia of the American. Therefore he asserts, 'Does anyone have a choice when they're dealing with Americans these days?' (Ghosh 10). Further her accented pronunciation which in fact helps Kanai the translator sure about the American origin of the feminine self that he is interacting with establishes her as the linguistic 'other' to the place she enters as 'a catelogist ' (Ghosh 11). To emphasize on her own linguistic otherization her self-conscious confession 'ami Bangla janina' brings into prominence her voluntary 'withdrawal' from the supposedly inferior linguistic community and her tendency refers to the 'politico-cultural eminence' as incorporated by the 'language of power' (Anderson 37). This very attitude of Piya primarily establishes her stand as one against the uniformity of language. In one of his interviews to an UN chronicle Amitav Ghosh himself says :

I think the world has been globalizing for a long time. It is not a new phenomenon, but one that has achieved a new kind of intensity in recent years. The only real barrier to a complete uniformity around the world is not the image but language. Images can be exchanged between cultures, but the domain where globalization has truly been resisted as that of language. We can send e-mails, which can be instantly translated, but that is shallow communication. For any kind

of deeper, resonant communication, language is essential. All such communication is always deeply embedded in language. (www.amitavghosh.com)

Here Piya's admittance of being competent only in 'English' as a 'private property language' in contrast to the polyglot Kanai refers to her inclination only towards the language of power and nothing else. Here in this regard Piya resembles the Western faced narrative strategy of Ila in Amitav Ghosh's *The Shadow Lines* . The way Ila being the daughter of a diplomat travels around the world and her route through multifarious culture causes a haze in the narrative of her own life for which she refuses to accept the memory of her 'childhood days identifying it to be 'bloody culture' and clings to the English culture that never accepts her. In the similar vein Piyali Roy being the daughter of an immigrant father who 'left' Calcutta the birthplace of Piya when she 'was just a year old' draws contrast between Kanai's 'Calcutta' and her updated imagination of 'Kolkata' of the present. Again sometimes being much defensive regarding the lingering Bengali sound of her name and with a natural unease regarding herself being uncomfortable in Bengali makes her immediately shift her topic. Further her halting and accentuated pronunciation of the name Kanai as 'Kan-ay' is nothing but a reflection on her restless effort to establish her self-defined otherised identity.

However, her purpose of coming with the assignment of observing marine mammals by roaming through the water always already lingers with the denunciation of the factual details that she has gone through. The display of the availability or unavailability of the dolphins through her binoculars is always already found to have judged by the occidental standard of her vision. For example, she notes:

The discoverer of the Gangetic dolphin, William Roxburgh, had said explicitly that the fresh water dolphins of the Ganges delighted in the 'labyrinth of rivers, and creeks to the South and South-East of

Calcutta (Ghosh 42).

But the irony lies in the fact that all her literate gestures, her doctored etiquettes, are reduced to the level of useless nothing as she is supposed to take a Bengali guide with due permission of the forest department and later on an illiterate fisherman like Fokir that are far more articulate and experienced to make her accustomed with every single move of the waves that are familiar and manageable to the former and, malevolent and aggressive to the latter. For continuing with the research endeavour she is supposed to spend a good many days with the aforementioned illiterate with whom she again happens to feel an unacknowledged feeling of rootedness in the core of her mind. The fisherman who proves to be the convenient medium for Piya to get in to the world of the dolphins as the object of her study in her effort of translating the ways of the world of the tide country is described by Ghosh thus:

Now it was the fisherman who was in front of her, squatting on his hunches and looking into her face with an inquiring frown. Slowly, as her shivering passed, his face relaxed into a smile, with a finger on his chest, pointing at himself, he said, 'Fokir'. She understood that this was his name and responded with her own: 'Piya', with a nod of acknowledgement, he turned to the boy and said, 'Tutul'. Then this foreigner moved, from himself to the boy and back again, and she knew he was telling the boy that he was his son.

(Ghosh 63).

This becomes even remarkably striking that violating all the standards of sophistication and like a woman like Piya having had 'her graduate programme at the Scripps Instution of Oceanography in California' along with her 'cultural eminence' feels an unacknowledged sense of curiosity mixed with a bit of jealousy while thinking about the owner of the sari that she happens to find in the boat which she boards along with Fokir (Anderson 37). The strange soliloquy that haunts him with the questions:

Whom did the sari belong to? His wife? The boy's mother? Were the two same? Although she would have liked to know, it caused her no great regret that she lacked the means of finding out. In a way it was a relief to be spread the responsibilities that came with a knowledge of the details of another life (Ghosh 72).

This very curiosity regarding the life of others indicates to the constructive possibility of a bond to be tied up between the inhabitants of the world situated at the opposite poles. And her methodical journey towards the search of Orcella has been guided by the unorganised and supposedly uncivilized Fokir who even doesn't know how to give vent to organised expression. The arrangement of bath by Fokir for Piya within a tiny bathroom accommodated with yellow light of the lamp, half-consisted of fresh water and a bucket filled with brackish water, cake of soap on a ledge, plastic sachet of shampoo although do not provide her with the luxury of a five star hotel, draws her close to the domain of 'home'. Therefore the idea of throwing the sachet of shampoo though occurs in her mind, but in a natural course gets washed away. Rather a cerebral thinking occurs in her mind that the sachet of shampoo is a treasure in the island and by using it she intends to show off the bubbles on the water in order to provide Fokir with the sense of acceptance as a gift. Even the short piece of cloth with 'rectangles of chequered' fabrications 'left draped on the bamboo awning for her use' makes her feel home and to busk in memory of her father's habit of using the towel. Her desperate search for the meaning of the cloth with fabricated chequered signs that Fokir names as '*gamcha'* leaves herself amidst the vortex of meaningful words. The unnatural expression that she receives from Fokir for not being able to memorize the name of it once again makes her feel to go back to the root of her language that constructs the discourse of the world that she was once given birth to from the route of those useless verbal communication that includes fashionable 'stainless steel', accumulated 'resentments' and so forth (Ghosh 93-94). Such flash backs further emphasizes and problematizes the trajectory of

conveying the actual meaning. It is in reality the cordial arrangement made by Fokir that provides her with the ability to have a differentiated recollection of the memory of the hours of her way back from school when her mother's feeble responses in whatever language possible i.e. Bengali or English used to convey the message with definite meanings containing the experience her mother was supposed to go through. The irony lies in the fact that Piya who studies Orcaella through the ebb of memory and experience becomes a victim of the process of the way of their life. That is just as the Otcellea belonging to the two communities i.e. of salt and fresh water does not possess any anatomical difference as 'it had only to do with their choice of habitat' similarly the difference between the so-called foreigner Piya with that of the native Fokir is in reality the difference of their habitat that determines the habit(s) of the two. Robert Dixon notes :

The characters in Amitav Ghosh's novels do not occupy discrete cultures but dwell in travel in cultural spaces that flow across borders- the 'shadow line' drawn around modern status (Dixon 144).

The way of her monitoring and act of outlining the sketches of the shore from their tiny existential status in the boat and Piya's suggestion or demand of Fokir to row the boat in 'parallel lines over a quadrant shaped roughly like a triangle ' in reality in an imagistic manner refers to the parallel line of their gradual communication in progress. Later the unconscious surrender of Piya as she falls. Ghosh records:

But just the right moment, Fokir appeared directly in front of her, with his body positioned to block her fall. She landed heavily on his shoulder and once again she found herself soaking in the saity smell of his skin . In blocking her fall, she had thrown her arms around his torso as though he were a pillar or a tree trunk and one of her hands had caught hold of his shoulder-blade , digging into the recess between muscle and bone. Her other hand had slid down his bare

skin, coming to rest in the small of his back, and for an instant, she was paralysed with embarrassment (Ghosh 151).

Although the geo-cultural world of Piya and Fokir respectively are seldom translatable to each other, the movement of the waves makes it possible to get over the conception of the geographical boundary of the geo-political map of the world .The gradually built up rapport gets internalised between them so much so that their respective prejudice and mutual obscurity towards each other leads to the healthy translation of their worlds. And therefore, their mutual exchange of expression and observation get reflected through the mirrored images of the Dolphins, her object of study.

The very presence of Fokir does not really play an informative role of what Anderson calls as 'news' of the relative 'knowledge of the other' but in reality indicates to the interdependence of the 'metropole' on the inhabitants of the 'rural' . It is Fokir born out and out as a rustic boy brought up by his relative Horen, with his uncodified unsophisticated behaviour and supposedly cannibalistic figure with the bones of his chest pushing against his skin, like the ribs of a tin that had been stripped of its label (Ghosh 85). The performativity of Fokir flourishes much as he sings according to the spontaneity of his heart and the river of words he utters. Here in fact the river of Fokir's words problematizes the notion of the 'sacred books' the untranslatability of ' Allah's language' or that of the divine language as divine 'symbol from a community' and advocates the geo-cultural diversity of the land concerned (Anderson 13). The subsequent musicality remains untranslatable to Piya as it doesn't have any affinity with the so called civilized symphony that Piya so far has gone through. Hence is the case of Kanai who cannot translate his song (Ghosh 309).

Reducing Kanai's allegation on Fokir as 'not some kind of grass-root ecologist' but only a carnivorous as ' he kills animals for living', Fokir proves to be a saviour of Piya. Fokir stands with and beside Piya in the flood, in tide, in the ebb and flow of water, in the full moon and

above all on the verge of death with the warmth of human bond. His sacrificial death not in the mob but in a constant struggle with the power politics of nature that establishes him as a real performative who remains able to come across the border of constitutional law or that of cultural prejudice to justify the symbiosis of human relation claiming not pity but applause of the world inhabited by humans. Here the death that Fokir's voluntary will hugs with is not a spectacle of what Anderson calls 'self-sacrificing love' for the country of his origin but a reflection of cosmopolitanism, a sacrifice communicating a message of meeting across the world that even the league of the nation fails to offer.

Thus Amitav Ghosh's *The Hungry Tide* offers different symbolic modes of border crossing through the medium of the translation of the imagination of disparate characters with different and alike cultural roots. Memory and imagination play as the prime synthetic elements in the novel. In Ghosh's fictional reconstruct the geographical locale of Sundarbans appear to be a borderless land wherein individual human identity is constantly reshaped. Modes of migration appear very subtle in the novel. Piyali Roy moves between America and India whereas Sundarbans holds a history of human migration from the colonial days to the present. Kanai through his use of translated imagination crosses over cultures and languages. *The Hungry Tide*, thus captures a vision of cross-cultural understanding. The narratives of Fokir, the representative of the native culture and, that of Piyali, the representative of the Western nationalism respectively find the magical domain of Sundarbans as the meeting ground. Such meeting of translated imaginations and the subsequent journey of human individuals make Ghosh's fictional narrative a spectacle depicting the human movements across linguistic and cultural borders.

WORKS CITED

Dix, Hywel. ' You and Your Stories !' : Narrating the Histories of the Dispossed in Amitav

Ghosh's *The Hungry Tide* and Salman Rushdie's *Midnight's Children'*. Amitav

Ghosh: Critical Essays. Ed. PHI Learning pvt.Ltd. New Delhi. 2009. Print.

Dixon , Robert. 'Travelling in the West : The Writing of *Amitav Ghosh'. Amitav Ghosh: A Critical Companion*. TabishKhair. Delhi: Permanent Black . 2005. Print.

Ghosh, Amitav. *The Shadow Lines* . New Delhi: OUP, 1998. Print.

---. *The Hungry Tide*. London: Harper Collins.2004. Print.

---. *The Glass Palace*. London: Harper Collins. 2004. Print.

---.'Greatest Sorrow: Times of Joy Recalled in Wretchedness. *Imam and the Indian*. New Delhi: Ravi Dayal and Permanent Black. 2002. Print. Rushdie, Salman. *Midnight's Children*.London:Vintage.1995. Print.

Internet Sources

http://www.un.org/pubs/chronicle/2005/issue4/0405p48.html

http://philosophy.ucsc.edu/new-events/colloquia-conferences/Rushdie1992ImaginaryHomelands.pdf

http://www.pinterest.com/pin/

http://www.amitavghosh.com

Women And Children Trafficking In West Bengal – A Severe Crime Against Humanity

Jayjit Mondal

Abstract:

Nowadays women are on the top of every sector of science, society, education, administration, politics etc and they leave their bold foot prints everywhere. Other hand a large number of women and children in the world are victimized of severe crime like trafficking. West Bengal is in the vulnerable zone in this respect. Women and children trafficking is one of the burning problems in west Bengal. If India is the hub of the crime in the globe, then west Bengal is the centre of this crime. Women and girls are trafficked within the state for the purpose of commercial sexual exploitation and forced marriage. The study is trying to reveal a brief scenario about women and children trafficking in West Bengal.

Introduction:

According to the definition of the United Nations –"the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or service, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs."Human trafficking is a group of crimes involving the exploitation of men, women and children for financial gains which is violation of fundamental human rights. Victims are lured or

abducted from their homes and subsequently forced to work against their wishes through various means in various establishments, indulge in prostitution or subjected to various types of indignities and even killed or incapacitated for the purposes of begging and trade in human organs.

> "sex trafficking in which a commercial sex act is induced by force, fraud, or coercion, or in which the person induced to perform such an act has not attained 18 years of age; or the recruitment, harboring, transportation, provision, or obtaining of a person for labor or services, through the use of force, fraud, or coercion for the purpose of subjection to involuntary servitude, peonage, debt bondage, or slavery."

In the last one year, 14,000 adults and children have disappeared from West Bengal. Most of them are believed to have been swallowed up by the huge trafficking trade that is accustomed to treating West Bengal as its catchment area. The year before, around 28,000 women and children went missing and 19,000 of them remained untraceable. Missing women and children are ever increasing numbers in government files and reports by various organizations. But for their families, the hope never dies. they are lives, dearer than their own.

Objectives of The Study:

The main purposes of this study are

- To investigate the facts about women and children trafficking in West Bengal.
- To find out the causes behind the crime.
- To investigate results of the crime.
- To identify the solutions or remedies of this problem.

Hypotheses:

Parameter of social well being is closely related with this type of incidents. Trafficking free society indicates greater well being of the society.

reduce level of trafficking will be reduced sexual exploitation and suffering from both mental and physical issues.

Data Base Methodology:

The study is mixed one in the respect of methodology. Data are collected through secondary sources. The news paper reports, United Nations' reports, national crime record bureau etc are main sources of data. The categories of raw data are established by coding, tabulation and drawing statistical inferences for analysis. The collected data are analyzed with the help of various statistical measure.

Study Area:

The state of West Bengal have been selected for the study which lies between the latitude of 21°25Nto 26°50 N and longitude of 86°30 to 89°58E. It spreads over an area of about 80,968 sq. Km. Extending from the foot of Derjeeling Himalayas in the north to Bay of Bengal to the south (maximum stretch of about 580 km.) and from the edge of Chotanagpur high lands in the west to the border of Bangladesh and Assam in the east (maximum stretch of about 200km). It comprises 18 district of West Bengal.

Scenario of Trafficking In West Bengal:

West Bengal					
% of adult female untraced to those reported missing			% of children untraced to those reported missing		
1999	2000	2001	1999	2000	2001
71%	64.5	72.5	62.9	56.9	56.4

In terms of trafficking West Bengal is one of the most sensitive state. The Mukherjee and the NHRC has reported that it is a source of large scale Trafficking of Bengali women and Children in various Red Light Areas of India. It is a source transit as well as Destination and both. Also West Bengal is Transit as well as Destination and both. Place for

Cross Border Trafficking from Nepal and Bangladesh. Bangladesh shares a 4,156 km border with India that has 20 official check posts and out of its 32Source: Trafficking in Women and Children in India: NHRC Report 2005 districts, 30 districts are on the Indo-Bangladesh border. In Bangladesh, the collection points for trafficked women are usually far from border points. Women rescued in Uttar Dinajpur were from Cox's Bazaar (south). Girls from the Southern part of Bangladesh are usually trafficked across Northern borders. Illegal migration, trafficking and smuggling exist in varying degrees along the border. One study estimates that almost half of the trafficking to India takes places through Benapole in Jessore District. Entry points like Thakurbairi Chandurila, Kaiba Sultanpur, Chodarpur, Chapainaababgunj, Hili Akhwara, Chuadanga and Poladanga are other commonly used entry points to India. West Bengal has nine districts adjoining the border that are mostly different from one agriculturally, e.g., Nadia, where farmers primarily grow jute and betel leaves, is a prosperous area. The Sundarbans area of south / north 24 parganas is very weak agriculturally, and thus trafficking is a much more common economic activity for communities. Crossing between Bangladesh and West Bengal becomes a daily routine for many people as they may live in either of the countries and earn their living in the other. Thus, keeping a check of those being trafficked, married off, infiltrating, and immigrating illegally or irregularly is an uphill task and has to be achieved through innovative methods and day to day vigilance. Crossing the border takes not more than Rs. 50/- per person. Having crossed the border, the trafficked victims are mainly kept in West Bengal, and in some cases also in the state of Orissa. They are sorted and graded and sent to different destinations such as Middle East, Delhi, Mumbai, and Agra. Often, they are sold to pimps who then sell them to brothel keepers in red light areas of Kolkata such as Sonagachi, Kalighat, Bowbazar. Some are sent to Bashirghat in the neighboring district of 24 Paraganas. Initially young married women were trafficked from Bangladesh to Mumbai but in the past eight years demand for the

young unmarried and minor girls has increased. Many Bangladeshi women are the victims of polygamy. If not, divorced they have so called husbands who live off their earnings. In return, they have the status of being a married woman and a hope that they would return home. In many cases, the husbands are the pimps. Trafficked women prefer to stay away from the conventional red lights areas by renting in smaller tenements at Ray Road, Saat Road and such other places perhaps because of the fear of raids and police harassment. A number of women claim to have maintained regular family connections and state that they visit their family in Bangladesh occasionally. A study conducted in West Bengal reported that ten per cent each of the prostitutes in Calcutta were from Nepal and Bangladesh in 1997. These girls are generally drugged while they are trafficked from villages to the destination. A fraud marriage help escape from police mechanism which demands money and the share of pimps and traffickers goes down Kakarvitta, Jogbani, Pashupatinagar, Koshi Barrage and Bhadrapur are the entry points for getting into India from Nepal (Sinha, 1997:4,11-12). Most of the trafficked women from Nepal are reported to be involved in commercial sex market especially in New Delhi in Delhi, Mumbai in Maharastra and Calcutta in West Bengal. The sex markets in UP and Bihar states Varanasi, Kanpur and other red-light areas of Indian big cities. There is an inter-state and the demand of sex market in India (Rozario, 1988:103). Studies on Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar have shown some prevalence of Nepali women however,other states have no Nepali women or have them in a very insignificant number. West Bengal has accounted for 77.0% (87 cases out of 113 cases) of the total cases of 'Selling of Girls for Prostitution' reported in the country

Missing women and children in West Bengal- NHRC Report 2005					
Reported Missing Persons	**1996**	**2001**	**Total for 6 years**	**Yearly average for 6 years**	**2001 over 1996**
Female adults West Bengal	**187**	**193**	**1113**	**186**	**3%(+)**
Female adults India	**20,494**	**24,034**	**1,34, 870**	**22,480**	**17%(+)**
Female adults continue to remain missing West Bengal	**143**	**140**	**768**	**128**	**2%(-)**
Female adults continue to remain missing India	**4,627**	**6,181**	**32, 935**	**5,452**	**34%(+)**
Children West Bengal	**415**	**379**	**2955**	**493**	**9%((-)**
Children India	**41,410**	**46,347**	**2,66,847**	**44,476**	**12%(+)**
Children continue to remain missing West Bengal	**260**	**214**	**1762**	**294**	**18%(-)**
Children continue to remain missing India	**10,406**	**10,589**	**66,024**	**11,008**	**2%(+)**
Source: Trafficking in Women and Children in India: NHRC Report 2005					

Cases Registered Under Human Trafficking During 2011

State / UT	Buying of Girls for Prostitution	SeSelling of Girls for Prostitution	Procuration of Minor Girls	Importation of Girls	Immoral Trafficking (Prevention) Act, 1956	Total
Andhra Pradesh	0	2	106	0	497	505
Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0
Assam	0	0	142	2	21	165
Bihar	1	1	183	10	23	218
Chhattisgarh	0	1	15	2	15	33
Goa	0	0	0	0	18	18
Gujarat	0	0	4	0	46	50
Haryana	2	2	0	0	57	61
Himachal Pradesh	0	0	3	0	2	5
Jammu & Kashmir	0	0	0	0	1	1
Jharkhand	1	6	15	6	15	43
Karnataka	0	1	8	12	351	372
Kerala	0	0	9	0	197	206
Madhya Pradesh	2	3	20	45	24	94
Maharashtra	20	2	20	0	390	432
Manipur	0	0	0	0	0	0
Meghalaya	0	0	0	3	2	5
Mizoram	0	0	0	0	8	8
Nagaland	0	0	0	0	2	2
Odisha	0	0	12	0	23	38
Punjab	0	0	0	0	50	50
Rajasthan	0	2	19	0	81	102
Sikkim	0	0	0	0	1	1
Tamil Nadu	0	0	0	0	420	420
Tripura	0	0	5	0	2	7
Uttar Pradesh	1	4	0	0	43	48
Uttarakhand	0	0	0	0	3	3
West Bengal	0	87	298	0	96	481
Delhi	0	2	3	0	33	38

Source:NCRB

Causes of Women And Children Trafficking In West Bengal:

Young girls and women belonging to poor families are at higher risk.Then comes the economic injustice and poverty. Sometimes parents are also desperate to sell their daughters to earn money.Social inequality, regional gender preference, imbalance and corruption are the other leading causes of human trafficking in West Bengal.Parents in tribal areas think that sending their kids means a better life in terms of education and safety. Parents also pay about Rs 6000-7000 to these agents for food and shelter

Forced marriage

Girls and women are not only trafficked for prostitution but also bought and sold like commodity in many regions of India where female ratio is less as compared to male due to female infanticide. These are then forced to marry.

Bonded labour

Though debt labour is not known much but it is illegal in India and prevalent in our society. According to the International Labour Organization there are more than 11.7 million people working as a forced labour in the Asia-Pacific region. People running out of cash generally sell their kids as debt labour in exchange for cash. Both boys and girls are sold for this purpose and generally not paid for years.

Victims of human trafficking have great chances of suffering from issues like mental disorders, depression and anxiety. Women forced into sexual trafficking have at higher risk of getting affected from HIV and other STDs.

Illegal activities

Children, over adults are often chosen to be trafficked for illegal activities such as begging and organ trade, as they are seen as more vulnerable. Not only are these children being forced to beg for

money, but a significant number of those on the streets have had limbs forcibly amputated, or even acid poured into their eyes to blind them by gang masters. Those who are injured tend to make more money, which is why they are often abused in this way.Organ trade is also common, when traffickers trick or force children to give up an organ

Sexual exploitation

Sexual exploitation is an issue that is faced among many developing countries and is defined as “the sexual abuse of children and youth through the exchange of sex or sexual acts for drugs, food, shelter, protection, other basics of life, and/or money”. Often young girls are taken from their homes and sold as items to become sex slaves and even forced into prostitution. This may seem bad enough, but sexual exploitation is not always forced. Out of desperation, some parents will even sell their kids off to be sexually abused, in order to be able to acquire the basic necessities of life. As the parents are likely to have been sexually abused as children, generations to come are forced to live in this seemingly never-ending cycle of selling their children into sexual exploitation and abuse

Prosecution

The Government of India penalises trafficking for commercial sexual exploitation through the Immoral Trafficking Prevention Act (ITPA). Prescribed penalty under the ITPA – ranging from seven years' to life imprisonment – are sufficiently stringent and commensurate with those for other grave crimes. India also prohibits bonded and forced labour through the Bonded Labor Abolition Act, the Child Labor Act, and the Juvenile Justice Act.Indian authorities also use Sections 366(A) and 372 of the Indian Penal Code, prohibiting kidnapping and selling minors into prostitution respectively, to arrest traffickers. Penalties under these provisions are a maximum of ten years' imprisonment and a fine.Bondedlabour and the movement of sex trafficking victims, may occasionally be facilitated by corrupt

officials.They protect brothels that exploit victims, and protect traffickers and brothel keepers from arrest and other threats of enforcement.Usually, there are no efforts made to tackle the problem of government officials' complicity in trafficking workers for overseas employment. Bulk of bonded labour heads for Middle East to emerging economies and there are several media reports which report on the illegal and inhumane trafficking of Indian workers.There are so many laws against this type of crimes are

I) Procuration of minor girls (section 366-A IPC)
ii) Importation of girls ((Sec. 366-B IPC)
iii) Selling of girls for prostitution (Section-372 IPC)
iv) Buying of girls for prostitution (Section -373 IPC)
v) Immoral Trafficking (Prevention) Act 1956
vi) Child Marriage Restraint Act,1929.
vi) Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000
iii) Child Labour (Prohibition and Regulation) Act 1986
iv) Transplantation of Human Organs Act 1994.

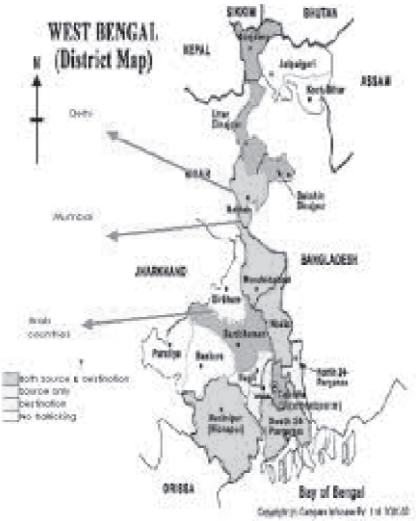

The map of West Bengal shows the source and destination areas for those who are trafficked within the State. The red arrows show the destinations outside.

State-wise & Category-wise Cases Of Human Trafficking In 2012

State/UT	2012					
	Buying of Girls for Prostitution	Selling of Girls for Prostitution	Procuration of Minor Girls	Importation of girls	Immoral Traffickin g (Prevention) Act	Total
West Bengal	3	56	369	12	109	549
Tamil Nadu	0	0	28	0	500	528
Andhra Pradesh	0	4	30	0	472	506
Karnataka	5	0	45	32	335	412
Maharashtra	0	2	31	0	366	403
Kerala	0	0	10	0	210	220
Total (All India)	15	108	809	59	2,563	3,554

Source: NCRB

Protection: Victims of bonded labor are entitled to ₹ 10,000 ($185) from the central government for rehabilitation, but this programme is unevenly executed across the country. Government authorities do not proactively identify and rescue bonded labourers, so few victims receive this assistance. Although children trafficked for forced labour may be housed in government shelters and are entitled to₹ 20,000 ($370), the quality of many of these homes remains poor and the disbursement of rehabilitation funds is sporadic:The Government of India launched an anti human trafficking web portal in February 2014 that they hope will be an effective way for interested parties to share information about this topic

Data From National Crime Record Burau 2013

Total Number of Cases : 1,224

1. **West Bengal : 486 (39.7%)**
2. **Bihar: 193 (15.8%)**
3. **Assam : 129 (10.5%)**

Recommendations: The governments need to redefine laws to make them more stringent and ensure severe punishment delivered quickly. The Government must ensure that the necessary and effective infrastructure is in place to identify, arrest, prosecute all involved in the trafficking chain. Unless the entire chain feels the heat of the prosecuting agencies with active support from NGOs and Civil Society, our children will continue to be threatened by this social evil. **Trafficking in Persons Report (TIP)**.2014 clearly mandates that all governments have to focus on:Prevention , Prosecution, Protection.

Conclusion:

The human trafficking is a inhuman activity which usually occurs in backward areas like West Bengal, where it involves the poor exploited by those who initially promised income if they been accepted for work place and in accordance with the sector and where they live and narrowness needed. Simple poor people are already in financial problems, and this makes them willing to place themselves in anywhere without investigating the background and basic information that what will be their job. Furthermore, they are also ignorant about their rights and the importance of understanding how to defend themselves from deceived and they are unable to get out when hit by this problem. The best solution is comprehensive, especially the involvement of government in formulating and drafting laws that can protect people from falling prey to problems. Moreover, NGOs' can help the Government because the NGO's can carry out the duties that cannot be carried out by Government. This issue will only be done if all the emphasis and direct assistance whether in terms of moral and financial, and suggestions with combating this commercial crimes. Counter-trafficking strategies and programs have been inadequate to stop the expansion.

References:

i. National Crime Record Bureau Report 2011

ii. 2014 Trafficking in Persons Report (TIP)

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking_in_India

iii.

iv. The Times of India

v. The Hindu https://en.wikipedia.org/wiki/Child_trafficking_in_India

vi.

vii. timesofindia.indiatimes.com/india/**Bengal**-tops-UN.../21075876.cms

viii. Trafficking in Women and Children in India: NHRC Report 2005

ix. Girls/ Women in prostitution in India, Mukherjee 2004

x. https://asiafoundation.org/... /Stanford **HumanTrafficking** India Final **Report**

xi. N ational Crime Record Bureau Report 2012

xii. National Crime Record Bureau Report 2013

xiii. ncpcr.gov.in/view_file.php?fid=28

xiv. gvnet.com/**humantrafficking**/India.htm

Gravitational Waves in LIGO

Dr. Lina Paria

Abstract

Galileo pioneered the use of optical telescope by using visible light to observe the universe. Later on astronomers have found pulsars, quasars and other extreme objects by using the radio telescopes. Similarly using x-rays, gamma rays, ultraviolet rays and infrared rays, the observations have also brought new insights to astronomy. With the help of the gravitational wave detected on 14th September 2015 by the twin Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO) detectors, it would be possible to observe the universe in a new light that makes the gravitational wave astronomy more exciting. The double discovery of mutually orbiting Binary Black Hole system much heavier than solar mass, merging into a single black hole and the much awaited detection of gravitational waves are discussed in this article.

Introduction:

Albert Einstein publishes the general theory of relativity (GTR) in 1915, which was a revolutionary idea as it changed the concept of space- time completely. Einstein's equation tells that the matter (or energy in general) stresses and curves the space- time like an elastic medium. So in this framework, the Sun being heavy curves the space- time around it and the Earth moves in this curved space. One of the most important predictions of Einstein's theory is the existence of black holes. In 1916, Einstein predicts the existence of gravitational wave as a consequence of the general theory of relativity. He showed that the massive accelerating objects (such as neutron stars or black holes orbiting each other) would disrupt the space -time in such a way that the waves of distorted space would radiate from the source. These ripples are known as **gravitational waves** which travel with the speed of light through the Universe.

Characteristics of Gravitational wave:

The gravitational waves are able to carry energy, momentum and angular momentum away from the source just like electromagnetic waves, sound waves, water waves etc. As a result of this the binary system loses angular momentum as the two mutually orbiting objects spiralling in towards each other. This effect is called an inspiral which has been observed in the pulsar's system.

The distorted space-time will be observed by the observer as the gravitational wave passes by. So the distance between objects increases and decreases at a frequency to that of the wave. The frequency of the gravitational wave could be anything in principle, but very low frequency waves would be impossible to detect. The frequency range of plausibly detected gravitational waves as listed by Stephen Hawking and Werner Israel [1] are 10^{-7} Hz to 10^{11} Hz.

Gravitational waves are not electromagnetic radiation. Since these waves interact very weakly with matter (unlike electromagnetic radiation), they travel through the Universe virtually unhampered (very little absorption or scattering). These waves carry the information about their origins that is free of distortion or alteration suffered by electromagnetic radiation as it travels through the intergalactic space. Thus gravitational waves will truly open a new window on the Universe to examine the spectacular astrophysical objects and phenomena.

Gravitational Waves from Binary Black Holes:

The strongest gravitational waves are produced by some of the most energetic events such as colliding black holes, supernovae explosions, coalescing white dwarf stars or neutron stars, and also by the birth of the Universe itself.

There is now astrophysical evidence for black holes, whose mass ranges from few solar masses to several million solar masses. The LIGO collaboration announced on 11th February, 2016 that they have detected the gravitational waves on 14th September 2015 from the

merger of two black holes about 1.3 billion light years away from the Earth [2]. The merger event is named as **GW150914.**

Two mutually orbiting black holes of masses 29 solar mass ($29M_0$) and of about 36 solar mass ($36M_0$) merged into a single black hole of about 62 solar mass ($62M_0$) and spinning at 0.67 it's maximum possible value. Thus the mass difference of about 3 solar mass ($3M_0$) was radiated as gravitational waves (according to Einstein's formula ($m = E/c^2$)) in a fraction of second with a huge peak power output. In the case of GW150914, only two **detectors** were operating at the time of the event. So it was hard to pinpoint the exact location and the time of the event and it could lie anywhere within an arc-shaped region of space.

LIGO :

It had been observed that the binary system of pulsars are slowly orbiting around each other and loses energy through gravitational radiation. The expected decrease in their orbital periods had been measured with high accuracy [3] thus indirectly confirming the existence of gravitational radiation.

Though the gravitational waves are constantly passing Earth, their effects are very small as the sources are generally at a great distance. The gravitational wave set off by the event GW150914 reached Earth which changed the length of a 4-Km LIGO arm by a ten thousandth of the width of the atomic nucleus. This tiny effect even from such a strong gravitational waves makes them very difficult to detect in the Earth. Hence we do need very sophisticated detectors.

Currently the most sensitive **LIGO–the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory** has two detectors; one in Livingstone, Louisiana and the other at Hanford site in Richland, Washington.

LIGO is the world's largest gravitational wave observatory. Although it is called observatory but it is different from the so called astronomical observatory that people know about.

For example : (i) Since gravitational waves are not part of the electromagnetic spectrum (like visible light, radio waves, microwaves), so LIGO cannot see this e.m. radiation unlike optical or radio telescopes. (ii) Since LIGO doesn't need to collect light from stars or other objects, so it doesn't need to be dish-shaped like optical telescopes or radio dishes which collect and focus e.m. radiation to produce images of the source object. (iii) While astronomical observatory can function and collect data on it's own, LIGO cannot operate solo. The LIGO should have at least two detectors separated by a large distance, so that the local vibrations are not mistaken for the gravitational waves, and it should be definitely detected by both the detectors. These are the three prominent differences between LIGO (a gravitational wave observatory) and astronomical observatories.

LIGO's interferometers[4] are Michelson-type interferometers with *"Fabry Perot cavities*" as shown in Figure 1. The interferometers have two L-shaped arms each of 4 km length. Additional mirrors are placed near beam splitter so that each laser beam reflects back and forth along this 4 km length about 300 times before it finally merges with the beam from the other arm. These extra reflections serve two functions: (i) it increases the distance travelled by each laser beam from 4 km to about 1200 km, (ii) it stores the laser light within the interferometer for a longer period of time, thus increasing the LIGO's sensitivity which makes it capable of measuring the change in

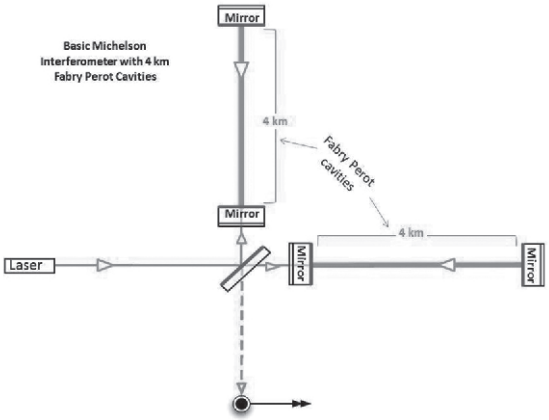

The optical schematic diagram of a Laser Interferometer

arm length thousands of time smaller than the size of the atomic nucleus, i.e. one part in 10^{19} m [5]. So with these Fabry Perot cavity arrangement, the LIGO's interferometer arms are not just 4 km long but effectively about 1200 km long while the size of the interferometer is manageable.

The gravitational waves coming from the astrophysical events are very weak with their wavelengths varying from few hundred to few thousand kilometers. They distort the space-time geometry as they passes through the Earth and in particular affects the two arms of the LIGO differently which could be detectable with its high sensitivity. The observation of similar signals by both the detectors of LIGO separated by about 3000 km indicates a genuine common source of the gravitational waves. Hundreds of sensors monitor the environment to map out noise from electromagnetic, seismic and other environmental disturbances. By data analysis[2], it is found out that the statistical probability for such an event due to chance coincidences from noise is less than $2x10^{-7}$**.**The LIGO thus confirms two spectacular discoveries : one is that the detected signals are the gravitational waves and the other is that the source of these was a binary black hole system. So this discovery is also very important for the astrophysicists to reconsider models of black hole formation especially in binary system.

The LSC and the LIGO-India Project :

The **LIGO Scientific Collaboration** (LSC) is a group of more than 1000 scientists from more than 90 universities and research institutes around Unites States and in 14 other countries including India. The electromagnetic signals coming from the gamma-ray bursts associated with the gravitational wave event is expected to be identified by LIGO in future. Hence it is extremely important to localise the source of this event in the sky. As it is hard to pinpoint the exact position of the sources of gravitational waves with just two existing detectors, a global network of detectors with intercontinental separations is required to localise gravitational

wave events accurately on the sky. **LIGO-India** project as proposed in 2011, aims to build an advanced LIGO detector in India in collaboration with LIGO-USA and its partner from Germany, UK and Australia. The LIGO-India project will bring together the best of fundamental science and technology in lasers, optics, ultra-high vacuum and control system engineering.

Conclusion:

The great discovery of the gravitational waves (as predicted by Einstein in 1916 in the General Theory of Relativity) detected by the twin detectors of LIGO, as well as the discovery of the existence of the stellar mass Binary Black Hole system is discussed here. This first-ever direct observation of gravitational waves opens up a new way to look at exotic stellar objects and events in the Universe which are still invisible by the present day telescopes. In future with the help of the global detector network, LIGO will be able to collect the data that can have far-reaching effects on many areas of physics including gravitation, relativity, astrophysics, cosmology, particle physics, and nuclear physics.

References:

1. Hawking, S., Israel, W., General Relativity: An Einstein Centenary Survey, Cambridge University Press, p.98, ISBN 0-521-22285-0.
2. Abbott, B.P. et al., Phys. Rev. Lett., 2016, **116**, 061102.
3. Taylor, J.H. and Weisberg, J.M., Astro-phys. J., 1982, **253**, 908-920
4. Aasi, J et al. , Class. Quantum Grav., 2015, **32**, 074001.
5. Gopakumar, R. & Wadia, S.R. Current Science, 2016, **110**, 1131

Borospherene : The New Boron Buckyball

Dr. Ratna Bandyopadhyay

Abstract: *After the discovery of carbon buckyballs the possibility of other elements to form similar characteristic structures.gathered much momentum. This created interest among various research groups to work on it. Since boron can form strong bonds with itself very similar to carbon, the focus on boron produced the desired fullerene like structure.*

Nanotechnology experienced a huge surge 30 years ago when a formation of carbon atoms shaped like a soccer ball was created, which became known as a buckyball. The discoverers were awarded the Nobel Prize in 1996 and the windfall of publicity that followed helped nanotechnology explode into technologists' interests across the world. Now researchers from Brown University (USA), Shanxi University (China) and Tsinghua University (China) have taken a small step to the left in the periodic table and developed a buckyball made from boron. Discovered in 1985, fullerenes were nicknamed "buckyballs" due to their resemblance to soccer balls. They have since sparked a revolution in nanotechnology and even inspired artwork and featured in popular culture.

Shortly after the carbon buckyball was found, scientists almost immediately began to ponder the possibility of other elements, which display similar characteristics to carbon, may also be able to form this unique structure. Among the main group of elements in the periodic table, boron can form strong bonds with itself, second only to carbon. This can be seen from the high melting temperature of solid boron, compared to graphite. Hence they believed, boron would be the most promising element to form fullerene-like

structures.

Lai-Sheng Wang, a professor of chemistry at Brown University, and his research team have shown that a cluster of 40 boron atoms can be combined, forming a structure they have named "borospherene". It is similar to the carbon buckyball and is a hollow molecular cage that had only been previously hypothesized. Wang and his colleagues describe the molecule, which they've dubbed borospherene, in the journal Nature Chemistry.

Wang's colleagues modeled over 10,000 possible arrangements of 40 boron atoms bonded to each other. The computer simulations estimate not only the shapes of the structures, but also estimate the electron binding energy for each structure—a measure of how tightly a molecule holds its electrons. The spectrum of binding energies serves as a unique fingerprint of each potential structure The next step is to test the actual binding energies of boron clusters in the laboratory to see if they match any of the theoretical structures generated by the computer. To do that, Wang and his colleagues used a technique called photoelectron spectroscopy. Chunks of bulk boron are zapped with a laser to create vapor of boron atoms. A jet of helium then freezes the vapor into tiny clusters of atoms. The clusters of 40 atoms were isolated by weight then zapped with a second laser, which knocks an electron out of the cluster. The ejected electron flies down a long tube Wang calls his "electron racetrack." The speed at which the electrons fly down the racetrack is used to determine the cluster's electron binding energy spectrum—its structural fingerprint.The experiments showed that 40atom clusters form two structures with distinct binding spectra. Those spectra turned out to be a dead-on match with the spectra for two structures generated by the computer models. One was a semi-flat molecule and the other was the buckyball-like spherical cage. The experimental sighting of a binding spectrum that matched their models was of paramount importance. The experiment gives these very specific signatures, and those signatures fit the models.

Borospherene B_{40} possesses a cube-like cage structure, whose six hexagonal and heptagonal holes each occupy a face of the cube. It also has eight triangular, close-packing B_6 structural blocks, each on an apex of the cube. All B atoms are on the surface of the cage, which is an ideal, well-defined system for chemistry. B_{40} differs from carbon fullerenes in terms of structure and bonding, and the pursuit of borospherene-based nanomaterials for hydrogen storage is thus intriguing from a fundamental point-of-view. Furthermore, borospherenes are lighter than carbon fullerenes, which make the former systems better candidates to reach a higher gravimetric capacity for hydrogen storage.

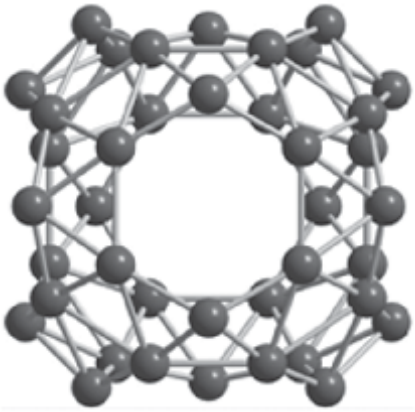

B40 Boron Buckyball (top view).

Boron-based nanomaterials are also candidates for lithium storage, and the ternary B-Li-H system is quite unique. Compared to transition metals Li as the lightest metal can definitely facilitate the improvement of hydrogen storage capacity for the metal-decorated B_{40} system .In metal decorated borospherenes while the neutral Li atom cannot bind more than one hydrogen atom, the cation can bind a large number of hydrogen atoms in molecular form. This contrasting behaviour originates from the fact that the bonding of hydrogen with neutral Li is covalent while that with the cation is primarily caused by polarization. But it would require an extensive research before boron buckyballs can take a lead role in storing the worlds cleanest fuel.

Reference:

Wang et.al *Nature Chemistry* **6**,727–731(2014)

Comparing Monetary Poverty and Multidimensional Poverty:

A Study based on NSSO Unit Level Data in the Context of the Backward Region of West Bengal

Jagabandhu Mandal, Dr. Pinaki Das

Abstract

The methods of analyses of poverty in India have usually suffered from a uni-dimensional limitation whereby they referred to only a unique proxy of poverty, namely equivalent consumption. They fail to capture many aspects of deprivation. All these give indication of serious limitation to measures of poverty based on a single monetary indicator of resources and underscore the strong need for a multidimensional approach to poverty analysis.

In the present study we exercise both uni-dimensional as well as multidimensional measures of poverty. The paper analysis the Multidimensional poverty index (MPI, which can be expressed as MPI=A x H, where H is head count ratio and A is reflects as multidimensional Intensity Poverty) is based on thirteen indicators grouped into five dimensions: education, housing, standard of living, food and employment security. The selected dimensions and indicators are mainly related with the availability in the NSSO 68th round Consumption Expenditure Survey 2011-12. On the basis of NSSO unit level data in three Backward district of West Bengal namely, Paschim Medinipur, Bankura, Purulia we have estimated multidimensional poor at the extent of 53.2 per cent among them only 26 per cent are poor in terms of monetary measurement based on consumption expenditure.

Keywords

I. Introduction

Poverty, as a serious problem in most developing countries, has

attracted a lot of attention among analysts also in India. The estimation of poverty in India is much debated during the recent years. However, most of the studies in India have tended to focus on poverty at a point of time and their methods of analyses have usually suffered from a uni-dimensional limitation (Filippone et al 2001), whereby they referred to only a unique proxy of poverty, namely equivalent income or consumption. They have also shared the traditional need to dichotomise the population into the poor and the non-poor by means of the so called poverty line. Thus in the view of Satterthwaite (2001) uni-dimensional poverty measures, at best, can lead to only a partial understanding of poverty, and often to unfocused or ineffective poverty reduction programs. They fail to capture many aspects of deprivation. These limitations of uni-dimensional poverty measures are also compounded by other technical difficulties of income measurement, especially in developing countries that reduce the value of such income-based uni-dimensional poverty results. All these give indications of serious limitations to measures of poverty based on a single monetary indicator of resources (Atkinson and Bourguignon 1982, Maasoumi 1998) and underscore the strong need for a multidimensional approach to poverty analysis that widens the concept of poverty to reflect, for instance, dimensions other than just the monetary one.

The past few years have seen a surge in mainstream multidimensional approaches to poverty and well-being in countries at variable levels of economic development as poverty reduction becomes a shared mandate across the world. In the academic literature, this trend can be seen, for example, in the two volumes on multidimensional poverty edited by Kakwani and Silber (2008) as well as in the proliferation of empirical papers on multidimensional poverty and inequality in traditional journals. In the policy environment, a mainstream interest in multidimensional approaches is exemplified by the Sarkozy commission's sub-group on Quality of Life measures called the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. At the

level of international institutions, since 1997 the World Bank has viewed poverty as a multidimensional phenomenon. The United Nations Development Programme has begun consultations to inform its 2010 report Re-thinking Human Development that almost certainly includes a multidimensional measure to complement the Human Development Index (HDI).

The impetus to develop a multidimensional framework has a range of diverse sources, which gives it a distinctive strength and stability. Amartya Sen, Robert Fogel, and other leading social scientists have given a normative account of the need for broader approaches, while Inglehart, Kahnemann, Layard and others have documented the lack of satisfaction resulting from development based on income alone. At the same time, empirical research has clarified the reach and limitations of income-based measures as well as the flaws in foundational assumptions regarding human preferences and behaviours. In practical terms, relevant data sources have expanded greatly, and better computer infrastructure enables better multidimensional analyses. In terms of policy space, the launch of the Millennium Development Goals (MDGs) in the year 2000 drew attention to eight interconnected aspects of human suffering and achievement which have formed the basis of campaigns that are ongoing in many countries. National and international interest in multidimensional measures of poverty and well-being is sharpened post-2009, as the economic down turn lends apolitical incentive to focus on dimensions of well-being that can grow even during economic recession (Alkire and Sarwar 2009).

Poverty in India has traditionally been measured in terms of consumption expenditure. The measurement of poverty remains centred on the ability to spend on goods and services rather than the capability to enjoy valuable beings and doings (Sen 1985) despite methodological revisions, debates (Planning Commission of India 2009; Deaton and Drèze 2002), acknowledgement of the multidimensional nature of poverty and of the need for inclusive

growth (Ahluwalia 2011). Poverty is multifaceted and deprivation in per-capita expenditure is important dimension of poverty. But, perhaps more surprisingly, income poverty does not accurately proxy other deprivations. Such measures can be used to track national poverty levels; to monitor changes by region, caste, and dimension; and to inform the Below Poverty Line (BPL) targeting methodologies that are commonly non-monetary in nature (Alkire and Seth 2013a).

In the present study we exercise both uni-dimensional as well as multidimensional measure of poverty. The uni-dimensional measure of poverty is based on consumption expenditure. The main dimensions associated with the measurement of multidimensional poverty and deprivations are indentified in Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) and Multidimensional Poverty Assessment Tool (MPAT). The OPHI has developed a new international measure of poverty – the Multidimensional Poverty Index or MPI – for the 20th Anniversary edition of the UNDP's flagship Human Development Report.

This study is entirely based on NSSO unit level data 68th round Consumption Expenditure Survey 2011-12. The three backward districts in West Bengal namely, PaschimMedinipur, Bankura, Purulia are purposely chosen for the present study both rural and urban are purposely chosen for the present study from the household level survey. From this data we calculate 22,95,873 households and 94,92,524 population for rural and 2,92,285 households and 12,44,175 representative population for urban across all caste category.

II. The Profile of the Study Area: The Backwardness

In India, apart from uneven distribution of geographical advantages, historical factors have contributed to regional inequities. India's successive Five Year Plans have stressed the need to develop backward regions of the country. In promoting regional balanced development, public sector enterprises were located in backward

areas of the country during the early phase of economic planning. In spite of pro-backward areas policies and programmes, considerable economic and social inequalities exist among different States of India as well as among the regions within a state (Bagchi 2011). During the era of liberalization the opening up of Indian economy appears to be correlated with rising spatial inequality. Global integration leads to a sharper expression of comparative advantage and regions well placed in terms of location, education, governance and other initial conditions tend to surge ahead as global opportunities are accessed while others lag behind. Spatial disparities in India align with other cleavages which threaten national unity and peace, whether it is the extreme of the "Maoist corridor" that matches the corridor of deprivation. The south-west part of West Bengal was also affected by extreme Maoist movement during 2009 and 2011. That generated shocks and risk on livelihood.

Maoist Movement in the Backward Region of West Bengal

The south-west part of West Bengal including a major part of West Medinipur, Bankura and Purulia District is literally marked as Jangalmahal. The name says that the major part of this region is covered by forest (or jungle). Maoist Movement (terrorism according to the state government) strongly affected the Jangalmahal region of West Bengal. Apparently, the reason behind this is the backwardness and historical deprivation of an ethnical group. But it is not the only reason. The various reasons lying behind this also include their demand for cultural identity (Iqbal 2014). In fact, West Bengal has witnessed a dramatic spurt in Maoist-related fatalities in 2010.[1] The incidents of terrorist activities and deaths in the Jangalmahal Region are depicted in Figure 1.The situation worsens during 2009 to 2011 and the livelihood of the people in Maoist affected area was deteriorating. After that the West Bengal State Government has attempted to execute and extend the social protection measure especially in the Maoist affected region.

Figure 1 The Incidents and Deaths by Maoist Activities in Jangalmahal Region of West Bengal, 2008 to 2012

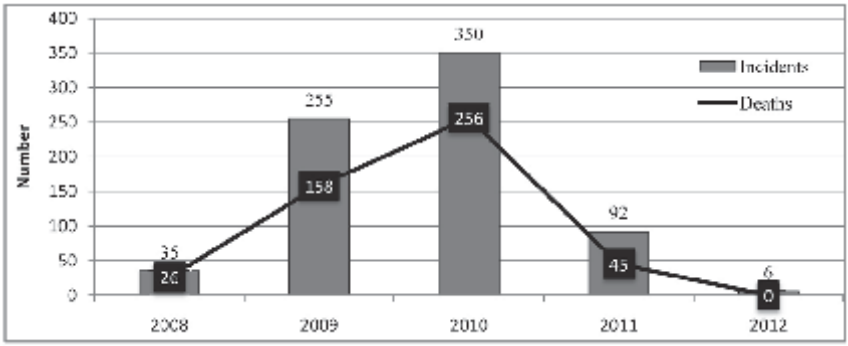

Characteristics of the Backward Region in West Bengal

Out of them the three districts – PaschimMednipur, Bankura and Purulia which are in the South-Western Region of West Bengal and boarding with Orissa, Jharkhand and Bihar is our proposed study area. This region is backward in respect of two categories of backwardness, namely drought prone and tribal areas. Nearly 38 per cent of tribal population of West Bengal is living in these four districts (Census of India 2011). Among 19 districts of West Bengal these three districts are also treated as drought prone districts (Entire Purulia district, 27 per cent of PaschimMedinipur and 32 per cent of Bankura are drought prone area). Not only that a significant area of these districts is forest land – 22 per cent Bankura, 18 per cent in PaschimMedinipur and 12 per cent in Purulia (State Forest Report 2010-11). These three districts are described as Jangalmahal of West Bengal meaning forest regions largely inhabited by tribal population. The region also exhibits the following socio-economic backwardness: a) agricultural is the main occupation; according to latest Census (2011) 63 per cent of the population are predominately dependent on agriculture for their livelihood), b) low agricultural productivity and low agricultural wage (Das 2010), c) excessive dependence on forest for livelihood and the problem of deforestation, d) cattle breeding, cottage industries, artisan products and collection of forest products are subsidiary occupations (Das 2010), e) lack of infrastructure and modern industries, d) lack of education, healthcare and other civic amenities, f) low level of education;

estimated literacy rate in this region is 61 per cent as per Census 2011 which is much lower than state average, and g) social backwardness with high unemployment and high incidence of poverty.

III. Status of Monetary Poverty in the Backward Region of West Bengal

The status of poverty is measured by using the methodology of Foster, Greer and Therbecke (1984) as

$$PI_{\propto} = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{PL - E_i}{\mathrm{PL}} \right)^{\propto} \quad ; \propto = 0, 1, and\ 2$$

Where, PL is the poverty line and E_i is the expenditure of the *i-th* household.

when, $\alpha = 0$, PI_0 implies the incidence of Poverty

$\alpha = 1$, PI_1 implies the depth of poverty and

$\alpha = 2$, PI_2 implies the severity of poverty

Trend and status of Poverty in the Backward Region

The status of poverty is estimated from NSSO Unit Level data. At sub-state level NSSO regional estimation is presentable. According to NSSO the three backward districts belong to the Western Plain of West Bengal. By following Tendulkar (2009) methodology we have estimated head count ratio (HCR), poverty gap ratio (PGP) and square poverty gap ratio (SPGP) in the selected backward region as well as in the state as whole for the years 2004-05, 2009-10 and 2011-12. The trends of poverty in the backward region and West Bengal are depicted in Figure 2. In 2004-05 the HCR in the backward region (constituted by Medinipur, Bankura and Purulia) was 36.8 per cent in comparison with 38.2 per cent in the whole of West Bengal. In the years that follow West Bengal witnessed significant reduction of poverty but not in the backward region. During 2009-10 to 2011-12 the HCR in the backward region stood near about 32 per cent. Whereas, in West Bengal the HCR fell from 28.8 per cent in 2009-10 to 22.5 per cent in 2011-12.The so called Moist Movement in the backward region adversely affected the livelihood of the people and hence the HCR is relatively high and the region has not

experienced reduction of poverty. The depth of poverty (PGP) and severity of poverty (SPGP) were also high in the backward region in comparison with West Bengal as whole.

Figure 2 Status of Poverty in Backward Region and West Bengal, 2004-05 to 2011-12

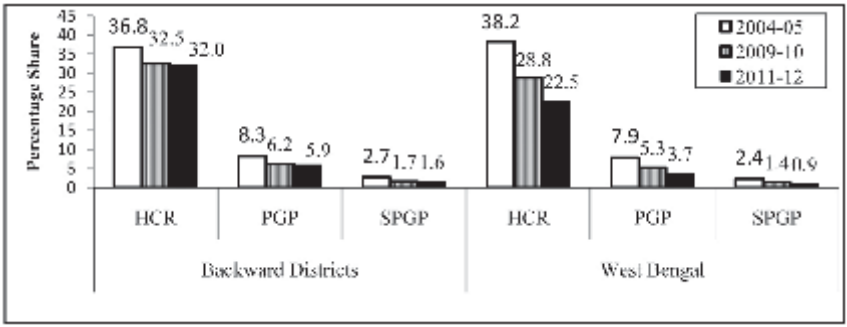

Source: Author's Calculation from NSSO Unit Level Data relating to Level and Pattern of Consumer Expenditure 2004-05, 2009-10 and 2011-12

Figure 3 Status of Poverty by Caste in Backward Region of West Bengal, 2011-12

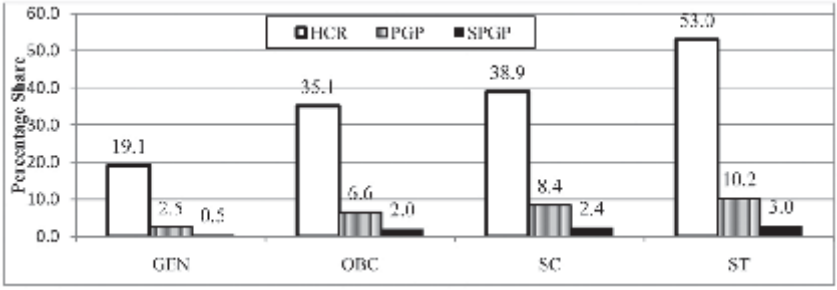

Source: As in Figure 1.

The situation of tribal people was worst in the backward region in the aftermath of Maoist Movement. The HCR of STs was as high as 53.0 per cent in 2011-12 in comparison with just 19.1 per cent of general caste (GEN) people. The poverty gap and square poverty gap were substantially high for the STs (Figure 3).

IV. Multidimensional Poverty and Deprivation of the Households

The Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) has developed a new international measure of poverty – the Multidimensional Poverty Index (MPI) – for the 20th Anniversary edition of the United Nations Development Programme's flagship Human Development Report. The international Multidimensional Poverty Index (MPI), which was developed by Alkire and Santos (2010, 2013) in collaboration with the UNDP and first appeared in the Human Development Report 2010, is one particular adaptation of the adjusted headcount ratio (Mo) as proposed in Alkire and Foster (2011).

The Multidimensional Poverty Index (MPI) identifies multiple deprivations at the individual level in education, health and standard of living. It uses micro data from household surveys, and—unlike the Inequality-adjusted Human Development Index—all the indicators needed to construct the measure must come from the same survey (more details can be found in Alkire and Santos 2010). The international MPI is an adaptation of a particular choice of indicators, deprivation cutoffs and relative weights, and a poverty cutoff. Alkire and Seth (2013) measured the multidimensional poverty in India on the basis of the NFHS for the years 1999 and 2006. In the present study we have made an attempt to measure the multidimensional poverty on the basis of latest NSSO 68th round survey on Level and Pattern of Consumption Expenditure.

The dimensions and indicators of a state's MPI are usually set according to the state's economic and social development stage and the level of economic and social welfare protected by its relevant laws and development strategies. In this paper, five equally weighted dimensions have been set for district's of West Bengal MPI. In the present case the MPI is based on thirteen indicators grouped into five dimensions reported in Table 1. The first column reports five dimensions: education, housing, standard of living, food & employment and social security. The second column reports the thirteen indicators. Each dimension is equally weighted and indicators within each dimension are also equally weighted. The third column reports the criteria of the deprivation cutoff of each of the thirteen indicators. The selection of dimension and indicators are mainly related with the availability in the NSSO surveys.

Table 1 Dimensions, Indicators, Deprivation Cut-offs and Weights of the International MPI

Calculation from NSSO unit data of Consumption Expenditures		
Dimension (Weight)	Indicators (Weight)	Deprivation Cut-off
Education (1/5)	Schooling (1/10)	Average Years of Schooling of households less than 5 years
	Gender Parity in Education(1/10)	Ratio of the years of education of female members[4] to the years of education of male members of the households is less than 1
Housing (1/5)	Electricity(1/15)	The household has no electricity
	Cooking Fuel (1/15)	The household cooks with dung, wood or charcoal
	Own House(1/15)	The household has not owned any house
Standard of Living (1/5)	Land(1/15)	The household doesn't own cultivable land
	Asset(1/15)	The household does not own Bi-cycle or radio or tape recorder or TV or Motor Cycle or Refrigerator
	Treated Water(1/30)	The household does notuse water purifier for water treatment
	Use of Toilet Articles (1/30)	The household does not use toilet soap, pest or brush
Food and Employment (1/5)	Food security(1/10)	The level of food consumption of the household is less than food security line
	Employment Status(1/10)	The member(s) of the household are not engaged as regular worker or self-employed.
Social Security (1/5)	Subsidized Food (1/10)	The eligible household has not received statutory amount of subsidized food grains from Public Distribution System of the Government.
	Free Meal (1/10)	The eligible household has not received free meals (from ICDS Centre and Mid Day Meal from School)[3]

In the NSSO survey there is no information relating to health. The health dimension seems to be missing. But the status of health and hygiene of members of the households indirectly reflects by food security, whether the household treated water or not and use of toilet articles.

Instantly each person is assigned a deprivation score according to his or her household's deprivations in each of the 13 component indicators. The maximum score is 100%, with each dimension equally weighted; thus the maximum score in each dimension is 20%. The education, food & employment and social security dimensions have two indicators each, so each component is worth 20/2, or 10%. The housing dimension has three indicators, so each component is worth 20/3,or 6.6%. The standard of

living dimension has four indicators, so each component is worth 20/4, or 5%.

To identify the multidimensional poor, the deprivation scores for each household are summed to obtain the household deprivation, c. A cut-off of 40%, which is the equivalent of two dimension among four dimension, is used to distinguish between the poor and non poor. If c is 40% or greater, that household (and every one in it) is multidimensional poor. The MPI value is the mean of deprivation scores c (above 40%) for the population and can be expressed as a product of two measures: the multidimensional headcount ratio and the intensity (or breadth) of poverty.

The headcount ratio, H, is the proportion of the population who are multidimensionaly poor:

$$H = \frac{q}{n}$$

Where q is the number of people who are multidimensionaly poor and n is the total population. The intensity of poverty, A, reflects the proportion of the weighted component indicators in which, on average, poor people are deprived. For poor households only (c greater than or equal to 40.0%), the deprivation scores are summed and divided by the total number of poor persons:

$$A = \sum_{1}^{q} c/q$$

where c is the deprivation score that the poor experience.

The MPI can be expressed as the product of H and A, i.e., MPI = A×H. The deprivation cutoffs are applied at the household level and thus refer to all members within the household. A household is identified as MPI poor if its deprivation score is larger than or equal to k = 1/5. Thus, MPI pursues an intermediate approach to the identification of the poor as discussed in Footnote 3. Being an adaptation of, the MPI can be expressed as MPI = A×H, where, H is referred to as the incidence of poverty and A as the intensity of poverty.

The Contribution of Dimension j. The deprivation score c of a poor person

can be expressed as the sum of deprivations in each dimension j (j = 1, 2, 3,4,5), c=c1+c2 +c3+c4+c5. The contribution of dimension j to multidimensional poverty[2]. The contribution of dimension j to multidimensional poverty can be expressed as

$$\text{Contrib}_j = ((\sum_1^q c_j)/n)/\text{MPI}$$

Sub group wise contribution

Table 2 Descriptive Statistics of Indicators& Dimension of Multidimensional Poverty

	Rural				Urban				Combined			
Indicators & Dimension	Min	Max	Mean	SD	Min	Max	Mean	SD	Min	Max	Mean	SD
Syrs of schooling	0.0	10.0	4.0	4.9	0.0	10.0	2.4	4.3	0.0	10.0	3.6	4.8
Gender	0.0	10.0	6.3	4.8	0.0	10.0	6.1	4.9	0.0	10.0	6.2	4.8
Education	**0.0**	**20.0**	**10.2**	**6.2**	**0.0**	**20.0**	**8.5**	**6.2**	**0.0**	**20.0**	**9.8**	**6.2**
Electricity	0.0	6.7	1.4	2.7	0.0	6.7	0.3	1.3	0.0	6.7	1.1	2.5
Cooking Fueal	0.0	6.7	4.3	3.2	0.0	6.7	0.9	2.3	0.0	6.7	3.5	3.3
Own Household	0.0	6.7	0.1	0.7	0.0	6.7	1.2	2.6	0.0	6.7	0.3	1.5
Housing	**0.0**	**20.0**	**5.8**	**4.5**	**0.0**	**13.3**	**2.4**	**3.4**	**0.0**	**20.0**	**5.0**	**4.5**
Land	0.0	6.7	0.3	1.3	0.0	6.7	1.2	2.6	0.0	6.7	0.5	1.7
Assets	0.0	6.7	0.7	2.0	0.0	6.7	0.5	1.7	0.0	6.7	0.6	2.0
Treated Water	0.0	3.3	3.1	0.8	0.0	3.3	2.3	1.5	0.0	3.3	2.9	1.1
Toilet aricle	0.0	3.3	0.7	1.4	0.0	3.3	0.3	0.9	0.0	3.3	0.6	1.3
Standard of Living	**0.0**	**20.0**	**4.8**	**3.3**	**0.0**	**20.0**	**4.3**	**4.1**	**0.0**	**20.0**	**4.7**	**3.5**
Food Security	0.0	10.0	0.7	2.6	0.0	10.0	0.8	2.8	0.0	10.0	0.7	2.6
Employment Status	0.0	10.0	3.9	4.9	0.0	10.0	1.9	3.9	0.0	10.0	3.4	4.8
Food and Employment	0.0	20.0	4.6	6.0	0.0	20.0	2.7	5.7	0.0	20.0	4.2	6.0
Food Subsidy	0.0	10.0	4.1	4.9	0.0	10.0	1.9	4.0	0.0	10.0	3.6	4.8
Meal Subsidy	0.0	10.0	3.5	4.3	0.0	10.0	3.6	4.8	0.0	10.0	3.7	4.5
Social Security	**0.0**	**20.0**	**6.6**	**6.3**	**0.0**	**20.0**	**5.5**	**6.0**	**0.0**	**20.0**	**6.4**	**6.3**
Total Deprivation	**0.0**	**80.0**	**32.1**	**16.4**	**0.0**	**66.7**	**23.5**	**14.1**	**0.0**	**80.0**	**30.1**	**16.3**

Source: Author's Calculation from NSSO Unit Leve Data relating to Level and Pattern of Consumer Expenditure 2011-12

Where n1 and x1 represents sub group wise population and poverty, on the other hand n and x represents total population multidimensional poverty of all population.

Table 2 represents the descriptive statistics of the thirteen indicators of multidimensional poverty of the households in rural urban and combined. Source: Author's Calculation from NSSO Unit Level Data relating to Level and Pattern of Consumer Expenditure 2011-12

Figure 4 describes the deprivation incidence of rural and urban households' thirteen indicators. It's shows that the deprivation rate of treated water and gender parity and employment rate are generally high among rural households than urban households. The treated water poverty rate is 99 percent and 82 percent rural and urban respectively. the poverty of average 5 years of schooling rate is 50 percent and 27 percent .But rural households' problem of deprivation in sanitation, cooking fuel, level is relatively prominent.

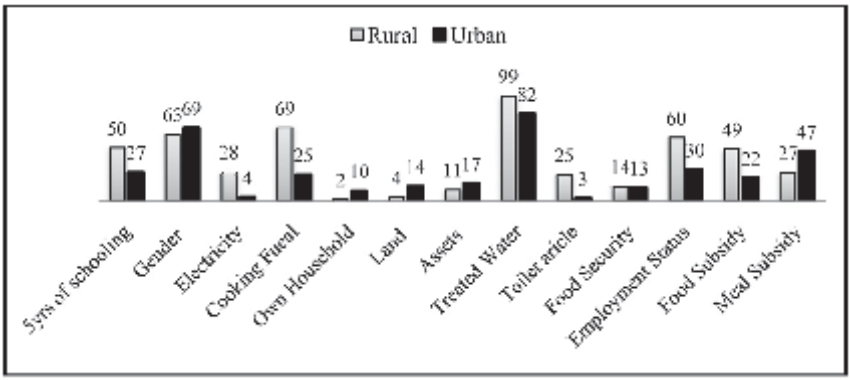

Figure -4 Poverty Incidental Rates of Households by Each indicator

The study represents a comparative status of household's deprivation. According to UNDP to identify the multidimensionaly poor, the deprivation scores for each household are summed to obtain the household deprivation, c. A cut-off of 40%, which is the equivalent of two-fifth of the weighted indicators, is used to distinguish between the poor and non-poor. If c is 40% or greater the household's is multidimensionaly poor. Households with a deprivation score greater than or equal to 20% but less than 33.3% are vulnerable to or at risk of becoming

multidimensionaly poor. Households with a deprivation score of 50% or higher are severely multidimensionaly poor and deprivation score higher than 60% which is implies households are three dimensionally deprived among five dimensions. In the rural urban combined 15.2 per cent ST households deprivation score is higher than 60% table 3.

Table 3 Percentage Distribution of Households Deprivations

Table 4 presents the results of MPI as well as the contribution of sub group. In the rural and urban MPI scores are 0.27 and 0.13 respectively, headcount ratios are 53%, and 24.6% .In case of rural MPI is higher in case

Region	Deprivation	0-19	20-33.33	33.34-40	40.01--50.00	50.01--60	>60.00	Total
Rural	ST	2.5	11.3	11.3	48.7	10.6	15.6	100
	SC	4.8	22.8	18.7	26.1	18.8	8.8	100
	OBC	9.6	34.8	22.3	17.5	11.9	3.9	100
	Others	17.4	44.9	9.3	12.4	13.4	2.6	100
	All Caste	10.4	32.0	14.2	22.4	14.6	6.5	100
Urban	ST	0.0	83.3	3.1	13.6	0.0	0.0	100
	SC	33.1	42.9	24.0	0.0	0.0	0.0	100
	OBC	37.9	33.4	3.7	16.1	9.0	0.0	100
	Others	24.4	49.8	2.9	10.1	12.9	0.3	100
	All Caste	25.8	48.0	4.3	10.3	11.3	0.3	100
Combined	ST	2.4	13.3	11.1	47.8	10.3	15.2	100
	SC	5.5	23.3	18.9	25.5	18.4	8.6	100
	OBC	12.6	34.7	20.3	17.3	11.6	3.5	100
	Others	18.8	45.7	8.0	12.0	13.3	2.1	100
	All Caste	12.2	33.8	13.1	21.0	14.2	5.8	100

Source: As in Table-2

of ST population in rural area but it is higher in urban of SC population.

Table 4 Multidimensional Poverty Indicators by Castes and Regions

After we compare the MPI value of different caste category, it would be interesting to analyze the source and contribution of different caste in the

	Rural			Urban			Combined		
	M0(HCR)	Intensity of Poverty	MPI	M0(HCR)	Intensity of Poverty	MPI	M0(HCR)	Intensity of Poverty	MPI
ST	81.5	52.1	0.42	16.7	45.9	0.08	79.7	52.0	0.42
SC	67.1	51.8	0.35	1.0	40.0	0.00	65.5	51.8	0.34
OBC	53.7	48.0	0.26	28.7	50.3	0.14	51.0	48.1	0.25
Others	33.2	51.0	0.17	26.1	51.9	0.14	31.8	51.2	0.16
All Total	53.2	51.2	0.27	24.5	51.6	0.13	49.9	51.2	0.26

Source: As in Table-2

overall poverty. In Table 5, we present the sub group wise contribution to multidimensional deprivation the decomposition of poverty across different caste category. It is evident from the table that the contribution of the SC category in rural area towards the overall poverty is merely 40.5 per cent while the contribution of others caste towards the overall poverty is nearly 26.1 per cent. But in the urban area others caste household are contribute more.

Table-5 Contribution to MPI of all Caste Category

Table-6 represent the test results it can be concluded that deprivation is significantly different in SC/ST than that of Non-SC/ST. The main reason

Caste	Rural		Urban		Combined	
	Population (%)	Contribution	Population(%)	Contribution	Population (%)	Contribution
ST	13.5	20.7	2.9	2.0	12.3	19.6
SC	32.1	40.5	6.1	0.2	29.1	38.2
OBC	12.5	12.7	11.5	13.4	12.4	12.7
Others	41.8	26.1	79.5	84.3	46.2	29.4
Total	100	100	100	100	100	100

Source: As in Table-2

behind this is that all household are different socio-economical status. However, average deprivation score for non-SC/ST (26.71) is dissimilar than that of SC/ST (37.82) and variance of Non-SC/ST(232.95) and SC/ST (255.49).

Note: μ_1 & σ_1 are the mean & sd of the labour productivity of OAEs, where

Table 6 Test of Deprivation between SC&ST and Non SC/ST

	SC&ST	Non SC/ST	Test of $H_0 : \sigma_1 = \sigma_2$ against $H_1 : \sigma_1 \neq \sigma_2$	Test of $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ against $H_1 : \mu_1 < \mu_2$
Mean	37.82	26.71	$F = \frac{\frac{s_1^2 n_1}{n_1 - 1}}{\frac{s_2^2 n_2}{n_2 - 1}}$ = 1.09677	$\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim \frac{W_1 t_{\alpha, n_1 - 1} + W_2 t_{\alpha, n_2 - 1}}{W_1 - W_2}$
SD	15.98	15.26		
SD^2	255.49	232.95		Where, $\bar{X}_1$ and $\bar{X}_2$ are respective means. Observed value is 9.533 Since the table value is 1.646 at 1 % level, the observed 'Approximate-t' leads to the rejection of H_0.
n	254	578		
df	253	577	Table value of F is 0.188165 at 1 % level. Therefore, H_0 is not rejected.	

as μ_2 & σ_2 are the respective values of ESTT, statistical tests have been done following the methodology of Goon, Gupta and Dasgupta (1968) pp, 396-404. Sources: Authors' calculation

Table 6 presents the dimensional contribution to multidimensional poverty. In the rural and urban area food and employment contribute higher than other dimension.

Table-6 Dimension wise Contribution to MPI

Status match between consumption and multidimensional poverty

Dimensional Contribution	Rural	Urban	Combined
Education	27	28	27
Housing	17	9	16
Standard of Living	12	17	12.4
Food & Employment	22	27	22
Social Security	22	19	22.1
Total	100	100	100

Source: As in Table-2

The previously presented evidence also raises the question of who are the income rich but multidimensional poor? Table 7 provides some information about multidimensional poor people with consumption based poverty. In case of Rural share of both MPI and consumption poor 26.6 percent. But in case of urban it decline to 20.3 percent. But increases percentages of non poor from 41.4 percent in rural to 68 per cent in urban. Overall percentage of poverty increases from 67.9 per cent in rural to 85.4 per cent in urban.(Table 7)

Table 7 Percentage Distribution of Poverty Status Match

Source: Table-1 * Status match is the percentage of households with

		Rural		Urban		Combined	
		Consumption		Consumption		Consumption	
		Poor	Non Poor	Poor	Non Poor	Poor	Non Poor
MPI	Poor	26.6	26.6	20.3	4.3	26.0	24.0
	Non Poor	5.0	41.4	7.4	68.0	6.0	44.0
Status Match*		67.9		88.3		70.3	

similar poverty status in both measures.

The percentage of households with MPI poor also declined across consumption quintile (Table 8). For bottom 20 per cent households in consumption quintile (i.e., very poor) 54 per cent are MPI poor in rural

area and 77.4 per cent in urban area. Whereas for top 20 per cent households (very good) in consumption quintile only 0.3 per cent are MPI poor in rural and 0.0 per cent in urban area respectively.

Table 8 Percentage distribution of Poverty status comparison between Consumption quintile and MPI Poor

V. Conclusion

	Rural	Urbar	Combined
Consumption Quintile	MPI Poor Percentage	MPI Poor Percentage	MPI Poor Percentage
Very Poor	50.0	83.1	51.9
Poor	30.8	12.0	29.8
Satisfactory	14.1	4.9	13.6
Good	3.4	0.0	3.2
Very Good	1.7	0.0	1.6
Total	100	100	100

Source: As in Table 2

The present study compares official income-based poverty measure with a multidimensional

poverty index based on the Alkire-Foster method, which is operationalized using the capability approach. Across different caste, poverty gap and square poverty gap are higher in case of back ward caste category. In respect of all indicators ST households more deprived than other caste. In the rural and urban area MPI scores are 0.24 and 0.13 respectively, headcount ratios are 55.6% and 29.1.In rural to urban MPI and consumption poor from 27.9 percent to 20.2 percent. But increases percentages of non poor from 4.1 percent to 7.5 percent. of those who are deemed poor. Likewise it helps to rationalize other findings, such as the income rich but multidimensionally poor.

Notes:

1.According to available data, 425 people including 328 civilians, 36 security forces personnel and 61 Maoists including cadre of the Maoist-backed People's Committee Against Police Atrocities, were killed in West Bengal in 2010 till December 26, as against 158 people including 134 civilians, 15 security forces personnel and nine Maoists killed in the State in 2009. With this, West Bengal has now earned the dubious distinction of recording the highest Maoist-related fatalities in 2010 dislodging Chhattisgarh which had topped the list since 2006. The intervening years have seen an extraordinary rise in Maoist-related fatalities in West Bengal

from just six in 2005, through 24 in 2008, and up to 158 and 418 people, respectively in 2009 and 2010 (Iqbal 2014).

[1] See Thorbecke's view that "most of the remaining issues in poverty analysis are related directly or indirectly to the multidimensional nature and dynamics of poverty" (Thorbecke 2005:2). See also the review in Jenkins and Micklewright (2007). Multilateral organizations such as the United Nations Development Programme (UNDP) and the World Bank have championed a multidimensional perspective on poverty (UNDP 2000; World Bank 2001b).

[2]For k = 1, the identification approach is referred to as the *intersection approach*; for $0 < k \leq \min_j\{w_1, w_2 \ldots, w_d\}$, it is referred to as the *union approach* (Atkinson 2003); and for $\min_j\{w_1, w_2 \ldots, w_d\} < k < 1$, it is referred to as the dual cutoff approach by Alkire and Foster, or more generally as *the intermediate approach.*

[3] If a household has no school-aged children, the household is treated as non-deprived.

[4]If no woman in a household has been asked this information, the household is treated to be non-deprived.

References

Ahmad, E., J. Dreze, J. Hills and A. Sen. 1991.Social Security in Developing Countries. Clarendon Press, Oxford.

Alkire, S. and J.E. Foster (2011) "Counting and Multidimensional Poverty Measurement," Journalof Public Economics, 95(7–): 476–487.

Alkire, S. and R. Kumar (2012) "Comparing Multidimensional Poverty and Consumption

Poverty Based on Primary Survey in India" presented in OPHI workshop, 21–22 Nov. 2012.

Alkire, S. and Roche, J.M. (2013): "How Successful are Countries in ReducingMultidimensionalPoverty? Insights from Inter-Temporal Analyses of Twenty-two Countries", Oxford Poverty& Human Development Initiative.

Alkire, S., J.M. Roche, M.E. Santos, and S. Seth (2011) "Multidimensional

Poverty Index 2011:Brief Methodological Note." Oxford Poverty and Human Development Initiative, OxfordUniversity. Available at http://www.ophi.org.uk/wp

Chakravarty, S.R., D. Mukherjee, and R.R. Renade (1998) "On the Family of Subgroup and

Factor Decomposable Measures of Multidimensional Poverty", Research on Economic Inequality,8: 175–194.

Elbers, C., J.W. Gunning and B. Kinsey. 2003. Growth and Risk. Discussion Paper TI 2003-068/2.Tinbergen Institute, Tinbergen.

Emerson, P. and A. Portela Souza. 2003. "Is there a child labor trap? Intergenerational persistence ofchild labor in Brazil." Economic Development and Cultural Change, Vol. 51, No. 2, pp. 375–398.

Guarceli, L., F. Mealli and F.C. Rosati. 2003. Household Vulnerability and Child Labour: The Effects ofShocks, Credit Rationing and Insurance. Working Paper.Understanding Children's Work,Florence.

Schubert, B. 2005.The Pilot Social Cash Transfer Scheme, Kalomo District, Zambia.Working Paper 52.Chronic Poverty Research Centre, Manchester.

Sen, A. 1999.Development as Freedom. Oxford University Press, Oxford.

———. 1993. "Capability and well-being." In M. Nussbaum and A. Sen (eds.), The Quality of Life.Oxford University Press, Oxford.

———. 1985. Commodities and Capabilities. North-Holland, Amsterdam.

Self-Help Groups in India – A Study

Paromita Dutta
Assistant Professor, Department of Commerce
Uluberia College

Abstract

A Self Help Group is a group of 10-20 women or men who work for the capacity building of themselves. The goal of Self help groups (SHG) is to become effective agents of change. They serve as a platform to establish the banking with the poor which is reliable, accountable and a profitable business. SHG also enables livelihood opportunities for village women through micro–credit with the existing banks in the area. To address challenges and to contribute to a healthy, balanced and sustainable growth of the SHG sector in the country, a National Network Enabling Self Help Movement in India (ENABLE) was formed in 2007 and conducted a comprehensive research study on the *'quality and sustainability of SHGs'* in eight states. In this study, i have tried to highlight the role of SHG operating in 8 states of the country.

Section 1

1. Introduction

India's Self Help Group (SHG) movement has emerged as the world's largest and most, successful network of community based organizations (CBOs). It is predominantly a women's movement. As some experts have pointed out, it is a development innovation in its own right.

The SHG bank linkage program (SBLP), which is the India's own innovation has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment programs. The SBLP had a

modest beginning with 255 credit linked groups and loan amount of Rs.29 lakh in 1992-93. Since then the program has grown exponentially. In the process, SHGs emerged as a mass movement across the country and largest community based microfinance model in the world. As per National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)'s microfinance report by March 2012, 79.6 lakh SHGs, with an estimated membership of 9.7 crores, have savings accounts in the banks, with aggregate bank balance of Rs. 6,551 crores. Over 43.54 lakh SHGs have loan accounts with total loan outstanding of Rs. 36,340 crores. However, there remain regional disparities in the growth of the SHG movement with limited progress in eastern and western regions.

MYRADA was an early promoter of SHGs. In the early eighties, MYRADA and the Bhagavatula Charitable Trust, of the Visakhapatnam district in Andhra Pradesh began mutual savings and credit groups in rural areas, mostly among women. These were probably the first instances of rural savings and credit groups in the country, for and of women. In the mid eighties, there were a few more similar experiments, mostly in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The results were inspiring, and the rural development departments of the Government of India, in the late eighties, invited NGOs, donors and bankers to discuss the possibility of consciously promoting savings and credit groups of women, across the country, in place of the earlier DWCRA groups (Development of Women & Children in Rural Areas).

In the mid nineties, SHGs became visible across the country. Several NGOs, most state governments, donors and lenders saw in SHGs an opportunity to mobilize rural women to work for their own social and economic betterment. By the late nineties, SHGs were not just savings and credit groups, but were seen as common interest groups. SHGs began sprouting up in many villages, with multiple SHGs being promoted in the same villages.

The important milestones in the evolution of the SHG movement

can be classified into six major phases:

- NGOs promote women SHGs as an alternative to mainstream financial services to reach un-reached segments of society;
- NABARD takes the lead in partnering with NGOs, particularly MYRADA, to pilot the well-known SHG-bank linkage model;
- State Governments, particularly in the South, take a proactive role in the promotion of SHGs in a big way, by way of revolving loan funds and other support;
- SHG-Bank linkage reaches the scale of over a million bank-linked SHGs;
- SHG federations emerge to sustain the SHG movement and to provide value-added services;
- SHGs and SHG federations are given widespread recognition to act as implementing agents of various mainstream agencies such as financial institutions, corporate sector, and government (**APMAS, 2007**).

While the SHG – bank linkage model has experienced exponential growth over the past decade, bank lending to SHG federations is currently being piloted. In the long-term, if the federations acting as 'business correspondent', hold considerable potential for financial inclusion, and this financial inclusion if done well, will prove to be a sustainable model. SHG federations will emerge as sustainable institutions of the poor, providing a basket of financial and livelihoods services to their member SHGs and ultimately to the women.

The SHG sector as a whole and SBLP in particular, has been facing a number of challenges such as uneven quality of groups, unequal growth, policy contradictions, huge shortage of capacity building infrastructure, including resource material and resource persons to support the Self Help Promoting Institutions (SHPIs). To address the

above challenges and to contribute to a healthy, balanced and sustainable growth of the SHG sector in the country, a National Network Enabling Self Help Movement in India (ENABLE) was formed in 2007 with a vision of *vibrant self help movement in India*.

To strengthen its evidence based advocacy through research, ENABLE conducted a comprehensive research study on the 'quality and sustainability of SHGs' in eight states,viz. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan and West Bengal. These state level studies were conducted with common research methodologies, uniform sample size and same research tools, so that the results are comparable and a national level synthesis study report could be prepared. Each of the 7-member organizations of ENABLE anchored these studies in their main operational states. In this study, i have tried to highlight the role of SHGs in these eight states.

The remaining part of the study deals with the following sections, Section 2 deals with literature review, Section 3 highlights the objectives of the study, Section 4 explores data analysis and methodology and finally, Section 5 highlights the economic impact on Self-help group members due to Self-help group programmes, Section 6 ends with conclusion and recommendations.

Section 2

2. Literature Review

Many research organizations, donor agencies, implementing agencies have conducted several studies, evaluations, impact studies and, assessments on SHGs and their federations across the country. And it is not possible to present a comprehensive review of all the research done so far. However, a brief overview of some of the large-scale studies conducted and published in the recent past is given below.

A study on the structure, conduct and performance of SHGs

promoted under the SHG bank linkage programme, to quantify the changes in savings and borrowing patterns among group members, to study the impact of the programme on the level and composition of income as well as employment of the group member households and to assess the changes in the social conditions of each member households due to their association with SHGs. The author concluded that, about 21 percent of groups had no place to conduct meetings. They conducted meetings either on the village roads or under the shade of village trees, etc. Low leadership rotation is an area of concern. It may lead to major information asymmetry and causation of moral hazards. Not only that, bankers show unenthusiastic attitude in promoting SHGs. Occasionally, they point out reasons like shortage of staff, time, etc. just to avoid dealing with SHG promotion. The study observed that, there is a necessity to build up an effective Management Information System (MIS) and a data base on SHGs at the district level. The study observed that many groups have conducted various developmental works in the village such as infrastructure development, construction of schools, roads, buildings, hospitals and even Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) projects. The study found out that, there is a need for greater thrust to human resource development (**Puhazhendi, V. and K.C. Badatya, 2002**). In another study, the author assessed the impact and sustainability of SHG–bank linkage on the socio-economic conditions of the individual members and their households in the pre-SHG and post-SHG scenarios. This study was conducted for India as a whole, covering six states of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Orissa, Uttar Pradesh and Assam. The author found that, the bank linkage programmes have significantly improved the access of the rural poor to financial services and have had considerable positive impact on the socio-economic conditions and the reduction of poverty of SHG members and their households. The author also reportedly suggested about the empowerment of women members and their increased self-confidence and positive behavioural changes in the post-SHG period

as compared to the pre-SHG period (**National Council of Applied Economic Research, 2008**). (**Salomo et. Al, 2010**) did a research on Sustainability of SHG Federation Structures covering 12 SHG federations in six different states of India. It opined that federating is needed for ensuring outreach, member ownership and governance, bottom up structured and linked multi-level systems, reduced dependency on external advisory and financial support, ability to face different environmental and socio-economic circumstances, and legal and regulatory framework.

Section 3

1. Objectives of the study

India is facing a number of challenges in consolidating, saturating and sustaining SHG movement, especially in SBLP. Towards this, the impediments need to be identified and appropriate strategies have to be developed to overcome the identified impediments. The Government promotional efforts need to be supplemented with learning from different states' experiences and independent assessments and observations of present status of SHG institutions in the country.

In the above context, a national study on SHGs has been undertaken. The major objective of the study is to understand the ***role of SHG movement in the country.***

Section 4

2. Data Analysis and Methodology

The study is descriptive in nature and covers 8 states of West Bengal Rajasthan, Assam, Bihar, West Bengal, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka promoted by various SHPIs such as Government, NGOs, banks and self or community.

2.1 Data Analysis

Number of SHGs: The data in table 1 shows that, the number of

SHGs is high in Karnataka with 9.62 lakhs followed by Andhra Pradesh with 9.02 lakhs and low in Gujarat with 2.21 lakhs compared to other states. The balance in a SHG saving bank account is high in Andhra Pradesh followed by West Bengal and Karnataka and low in Assam in compared to other states. The savings balance of an SHG on 31st March of a year is estimated as approximately 30% of the SHG's total savings. While 30% is in the savings bank account, the remaining 70% is with members in the form of loan outstanding.

Table 1: State-wise number of SHGs, Savings in SB Account and Loan Outstanding (Amount in Rs Lakhs)

Particulars	No. of SHGs	Savings amount in Rs. Lakhs	Loans disbursed amount	Loans Outstanding amount
Bihar	278608	36006.37	61056.39	100247.52
West Bengal	831011	153538.75	195378.62	377939.91
Assam	333686	11728.22	15865.56	66031.12
Gujarat	221350	18414.23	26625.68	30669.01
Maharashtra	789158	85745.68	160027.75	169731.90
Karnataka	962446	144242.13	625908.13	747474.74
Rajasthan	264119	16659.06	32177.19	65183.06
Andhra Pradesh	901517	414561.96	1156547.66	1722082.57

Source: Nabard, Status of Microfinance in India 2015-16

Grant has been sanctioned and released by state government of 8 states to Farmer's Club as self-help group promoting institutions (SHPI), shown in table 2 below.

The data in table 2 shows that as on March 2016, Nabard collaborated with Farmer's Club and released a grant to promote SHGs.

A third of the sanctioned amount was released to the SHPIs by NABARD. As such the promotional cost support from NABARD is less at Rs.4,000 per SHG. If only a part that is released to the SHPI, there will be serious issues related to the quality and sustainability of those SHGs promoted.

Table 2: Statewise Grant support sanctioned and released to Farmers' Clubs (FCs) as SHPIs as on 31 March 2016 (Amount in Rs. Lakhs)

Name of the state	Beneficiary Farmers' Clubs	SHGs to be promoted / credit linked	Grant sanctioned	Grant Released	No.of SHGs promoted	No.of SHGs savings linked	No.of SHGs credit linked
Bihar	0	0	0.00	0.00	0	0	0
West Bengal	87	1260	16.38	3.92	1260	1260	574
Assam	56	794	79.4	2.03	323	323	231
Gujarat	1	50	1.00	0.05	5	5	0
Maharasam a	0	0	0.00	0.00	0	0	0
Karnataka	0	0	0.00	0.00	0	0	0
Rajasthan	0	0	0.00	0.00	0	0	0
Andhra Pradesh	0	0	0.00	0.00	0	0	0

Source: Status of Micro-Finance in India, NABARD

Except in Bihar, Maharshtra, Karnataka, Rajasthan and Andhra Pradesh, more than 50 Farmer's Club have collaborated with Nabard in the West Bengal and Assam and only 1 in Gujarat; the number of SHGs promoted also varies from 5 to 1300. The SHG targets to Farmer's Club in West Bengal are high in comparison to other states. However, the ratio of savings linked to credit linked SHGs, 46% in West Bengal and 72% in Assam.

Growth of SHG Bank linkage programme in India during the last three years: The data in table 3 shows that the number of SHGs savings linked to banks has been increased during period 2013-14 to 2015-16. The balance in SHGs' SB accounts has increased during these three years. The amount of bank loans disbursed also increased and at the same time the number of SHGs having loans outstanding with banks has been decreased year to year.

However, the data shows a favourable working of SHGs during last three years.

Table 3: SHG-Bank Linkage Programme during the last three years (Amount in Rs Lakhs)

Particulars	2013-14	2014-15	2015-16
No. of SHGs savings linked	74,30,000	76,97,000	79,03,000
Savings amount in SB account (Rs. in lakh)	9,89,742	11,05,984	13,69,139
Bank loans disbursed to SHGs during the year	24,01,736	27,58,231	37,28,690
No. of SHGs having loan outstanding with banks	42,92,752	41,54,546	37,11,923

Source: Status of Micro-Finance in India, NABARD

Selection of SHG members: While forming a group, they drew up criteria to select members or reject others. During group discussions, most of the groups reported that, they considered the following criteria while selecting or rejecting members.

Table 4: Selection of SHG Members

Criteria	Inclusion	Exclusion
Geographic Aspects	Preference to women staying in the same street, area, locality and village.	No preference to women staying in other streets, areas and villages.
Economic Aspects	Poor; same economic activity; can pay savings and loan instalments Regularly.	Rich or non-poor; job holders; can't or will not pay savings and loan instalments regularly.
Social Aspects	Many members are known to each other: relatives, friends, and some other working relationships; Preference to same caste; More preference to non-migrant households.	Unknown people not admitted or selected as members. Different caste; Low preference to migrant households.
Personal Aspects	Good character; friendly; helps others; patient; and has faith on others: Mixes freely with others; Preference to literates; Preference to young and middle age women; Preference to women having experience in managing the group; Interest of both the members and household members, especially husband.	Quarrelsome, unfriendly, nuisance, no faith in others, attitude of dominating others; Illiteracy is not a bar; Not allowing aged persons; Not allowing women who defaulted in DWCRA groups; Low preference to women whose household members are not interested.
Group Procedures	Women willing to attend group meetings within and outside the village; Willing to respect group norms or procedures. Joined up to 20 members.	Unwilling to attend meetings within and/ or outside the village. No respect for group norms; Not joined more than 20 members.

The above criteria reveal that the groups have taken care while selecting or not selecting members of a group, which is required for smooth functioning and sustainability.

The state-wise details of Self-Help Group Bank Linkage Programme are given below:

Table 5: Table Showing State-wise Spread Of The Shg-bank Linkage Programme - Savings Of Shgs With Banks As On 31st March

States	No. of SHGs	Savings amount (Rs. in lakhs)	No. of SHGs (%)	Savings amount (%)
Andhra Pracesh	1448216	125525.98	20.83	20.25
Arunachal Pradesh	6418	164.89	0.09	0.03
Assam	218352	7359.94	3.14	1.19
Bihar	140824	8539.57	2.03	1.38
Chattisgarh	113983	7578.06	1.64	1.22
Goa	6745	3649.31	0.10	0.59
Gujarat	168180	32190.15	2.42	5.19
Haryana	36762	10762.55	0.53	1.74
Himachal Pradesh	50182	3490.9	0.72	0.56
Jammu and Kashmir	4366	1818.83	0.06	0.29
Jharkhand	79424	7421.81	1.14	1.20
Karnataka	534588	62705.32	7.69	10.12
Kerala	394197	37556.32	5.67	6.06
Madhya Pradesh	178226	10151.07	2.56	1.64
Maharashtra	770695	56828.02	11.08	9.17
Manipur	10831	218.56	0.16	0.04
Meghalaya	11787	360.25	0.17	0.06
Mizoram	5097	251.40	0.07	0.04
Nagaland	5926	334.37	0.09	0.05
New Delhi	2191	234.85	0.03	0.04
Odissa	503172	36473.5	7.24	5.88
Punjab	45005	3645.1	0.65	0.59
Rajasthan	213295	14255.08	3.07	2.30
Sikkim	2428	141.98	0.03	0.02
Tamil Nadu	826710	90373.26	11.89	14.58
Tripura	31349	3335.70	0.45	0.54
Uttar Pradesh	429760	26464.03	6.18	4.27
Uttarkhand	43997	7170.41	0.63	1.16
West Bengal	647059	59486.85	9.31	9.60
A & N Islands	3763	92.87	0.05	0.01
Puducherry	19723	1286.96	0.28	0.21
Total	6953250	619870.89	100	100

Source: Status of Micro-finance in India; A NABARD Publication.

The above table shows that the savings amount is highest in Andhra Pradesh, followed by Tamil Nadu, Karnataka, West Bengal and Gujarat.

Section 5

1. Economic Impact of SHG Members

A. Change in the saving pattern of SHG members

Table 5 presents the changes that occurred in the saving pattern of

the members during pre and post SHG period. It is found that there has been almost 80 per cent and 15 per cent increase in SHG members, who are now saving there money in Bank & Post Offices and SHG, while there has been a decrease of 85 per cent and 10 per cent members, who were earlier having cash in hand and provided loans to relatives. It can be concluded that SHG is having a good impact on members, in their ability to save their hard earned money.

Table 6: Change in the saving pattern of SHG Members

Particulars	PRE-SHG Number	Percentage	POST-SHG Number	Percentage
In Bank and P.O.	0	0	129	79.6
In SHG	0	0	25	15.4
Cash in Hand	146	90.1	8	4.9
Loan to Relatives and Friends	16	9.9	0	0
Total	162	100	162	100

A. Change in the cumulative saving pattern of SHG members per month

Table 6 presents the changes that occurred in the cumulative saving pattern of the SHG members during pre and post SHG period per month. It is found that there has been 74 per cent increase in SHG members who are currently saving more than Rs. 2000 per month, who were earlier saving nothing in the pre SHG period, while there has been a decrease of 10.5 per cent, 50 per cent and 13.6 per cent members, who were earlier saving between zero and Rs. 500, Rs. 500 and 1000 & Rs. 1000- 1500 per month and there has been no change in 8 members who were earlier also in the range of Rs. 1500 and 2000 per month. It can be concluded that SHG is having a good impact on the saving of the members.

Size of Loan taken till now

Table 7 presents the changes that occurred in the size of the loan taken till now by the SHG members. It is found that there have been

5.5, 5, 10.5, 14.8 and 19.8 per cent increase in SHG members from the pre SHG period, who had taken loan between zero and Rs. 5000, Rs. 5000-10000, Rs. 10000-20000 and Rs. 20000-35000 in the post SHG period, while there has been a decrease of 55.5 per cent members who had not taken till now and there has been no change in 8 members who were earlier also in the range of Rs. 35000 and 50000. It can be concluded that SHG is having a good impact on the drawing pattern of the members.

Table 7: Change in the cumulative savings pattern of SHG members per month

	PRE-SHG		POST-SHG	
Particulars	Number	Percentage	Number	Percentage
Rs.0-500	25	15.4	8	4.9
Rs.501-1000	89	54.9	8	4.9
Rs.1001-1500	40	24.8	18	11.2
Rs.1501-2000	8	4.9	8	4.9
More than Rs. 2000	0	0	120	74.1
Total	162	100	162	100

Table 8: Change in the cumulative savings pattern of SHG members per month

	PRE-SHG		POST-SHG	
Particulars	Number	Percentage	Number	Percentage
Nil	122	75.3	32	19.8
Less than Rs. 5000	16	9.9	25	15.4
Rs 5000-10000	8	4.9	16	9.9
Rs 10000-20000	0	0	17	10.5
Rs 20000-35000	0	0	24	14.8
Rs 35000-50000	8	4.9	8	4.9
More than Rs 50000	8	4.9	40	24.7
Total	162	100	162	100

A. Total No. of loans from SHG till now

Fig 1 presents the distribution of the sample SHG members on the basis of total number of loans taken from SHG till now. It can be seen that 24 SHG members (15 per cent) have not taken loan till now

from SHG, 65 members (40 per cent) have taken once, 49 members (30 per cent) have taken twice, 8 members (5 per cent) have taken thrice, 8 members (5 per cent) have taken four times and 8 members (5 per cent) have taken loan more than four times. So it can be concluded that the majority of sample SHG members have started taking loan from SHGs in order to run their day to day consumption expenses. Total No. of loans from Bank till now Fig 2 presents the distribution of the sample SHG members on the basis of total number of loans taken from Bank till now. It can be seen that 77 SHG members (47 per cent) have not taken loan till now from Bank, 47 members (29 per cent) have taken once, 16 members (10 per cent) have taken twice, 6 members (4 per cent) have taken thrice, 8 members (5 per cent) have taken four times and 8 members (5 per cent) have taken loan more than four times. So it can be concluded that the majority of sample SHG members have started taking loan from Bank in order to start their enterprises. Regarding change in asset value, it can be concluded that 113 SHG members (70 per cent) have increased their asset value in the post SHG period, 33 members (20 per cent) have no change in their asset value and only 16 members (10 per cent) have decreased their asset value. Therefore majority of the sample SHG members are benefited by joining the SHGs.

Fig 1: Number of times loan taken by SHG members

Fig 2: Distribution of sample SHG members on the basis of total no. of loans taken from bank

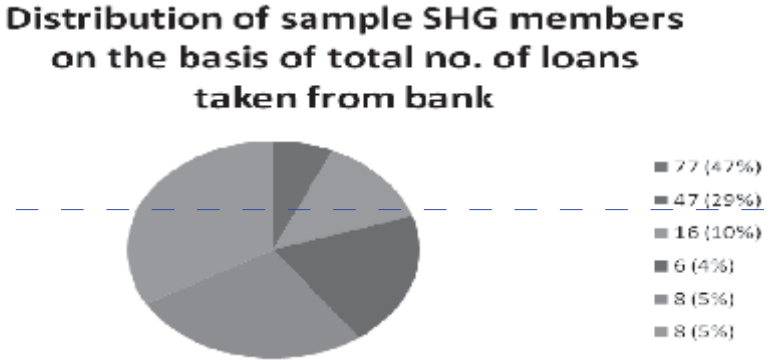

Section 6

6. Conclusion and Recommendations

The study highlights the fact that, regarding number of self help groups Karnataka stood highest, followed by Andhra Pradesh and West Bengal and for holding savings in Savings Bank account, Andhra Pradesh stood first, followed by West Bengal and Karnataka. Regarding the number of Farmer's Club, more than 50 Farmer's Club have collaborated with NABARD in West Bengal and Assam and only 1 in Gujarat; the number of SHGs promoted also varies from 5 to 1300. The SHG targets to Farmer's Club in West Bengal are high in comparison to other states. Not only that, the number of SHGs savings linked to banks has been increased during period 2013-14 to 2015-16. The balance in SHGs' SB accounts has also increased during these three years with a decrease in the number of SHGs loans outstanding with banks. Therefore, it can be concluded that the position of SHGs in West Bengal is favourable.

For promoting, developing and sustaining the SHG federations, the following specific recommendations are made:

· SHG federations require a national policy recognizing them as institutions of the poor. The policy must also provide for the SHG federations playing roles that they decide and there must be enabling provisions.

· NABARD to issue guidelines to all banks for providing bulk finance and other financial services to the SHG federations for enabling those SHG federations that choose to play a financial intermediation role.

· An appropriate legal form is needed for the SHG federations. Many SHG federations are registered under the cooperative laws, particularly in those states that have parallel liberal cooperative laws. Some SHG federations engaged in social intermediation are registered under the societies or trusts. However, these laws have been inadequate to serve the needs of the SHG federations. There is a need to draft a model SHG federation law at the national level based on wide consultations which can provide the framework for State Governments to enact specific legislations for SHG federations.

· Livelihood Organizations to be promoted. To provided livelihood promotion services, livelihood organizations need to be promoted. Those SHG members that are engaged in a particular livelihood can become a member of the livelihood organization.

· Training and capacity building organizations to be promoted and supported.

To provide need-based support to SHGs, SHG federations, livelihood organizations and other social organizations, considerable training and handholding support would be needed. District, State and National Level training and capacity building organizations need to be identified, developed and provided support for a period of 5-10 years.

In conclusion, SHG movement holds great promise for poverty reduction and women's empowerment as evident from a number of

studies, including this one. Some of the constraints faced by the SHGs must be addressed, the most important being the need for sustained training and capacity building support. Banks must look at SHG Bank linkage as a business opportunity and not just as a social obligation. Imbibing the principles of selfhelp, mutual benefit and self-reliance in the SHPIs and SHGs is a prerequisite. Broadening and deepening the engagement of SHGs would address the larger issues of inequalities and discrimination. SHG federations can have a useful role to play, if they are well-developed and have the required capacity. For SHG federations to be effective, a new legal for specifically meant for them is needed. Evolving an ecosystem to support the SHGs and their institutions will go a long way in realizing the vision of poverty free India.

References

1. APMAS (2007). "*SHG Federations in India",* Communication Division, APMAS, Hyderabad.

2. Puhazhendi, V. and K.C. Badatya (2002). *"SHG–Bank Linkage Programme for Rural Poor: An Impact Assessment"*, *Working paper*, NABARD, Mumbai.

3. National Council of Applied Economic Research (NCAER) (2008). *"Impact and Sustainability of SHG Bank Linkage Programme"*, New Delhi: NCAER.

4. MYRADA (2010). "*An Evaluation of Self Help Affinity Groups Promoted by Myrada",* Bangalore, Myrada Publication.

5. Wolfgang Salomo, et all (2010). *"A Study of SHG Federation Structures in India",* DGRV & APMAS.

6. Mehta, S.K., Mishra H.G. and Singh, A. (2011). "ROLE OF SELF HELP GROUPS IN SOCIO-ECONOMIC CHANGE OF VULNERABLE POOR OF JAMMU REGION", *International Conference on Economics and Finance Research*, Singapore.

About the Contributors

Prof. Supriyo Bhattacharya, Assoc. Prof. Dept. of Economics, Kalyani University

Dr. Chitrita Dutta Sarkar, Assoc. Prof. Dept of Bengali, Acharya Prafulla Chandra College, New Barrackpur

Dr. Jayashree Sarkar, Assoc. Prof. Dept. of History, Uluberia College

Dr. Momotaj Begam, Asst. Prof. Dept. of Bengali, Uluberia College

Sri Pritam Chakraborty, Guest Lecturer, Dept. of Bengali, Uluberia College

Sri Sourav Mondal, Asst. Prof., Dept of Bengali, Pakuahat Teachers' Education College.

Sri Biswajit Baxi, Guest Lecturer. Dept. of Political Science, Uluberia College.

Dalia Hazra, Asst. Prof. Dept. of History, Uluberia College

Dr. Aditi Bhattacharya, Assoc. Prof. Dept. of Philosophy, Uluberia College

Debolina Byaborto, Guest Lecturer, Dept. of English, Uluberia College

Sri Joyjit Mondal, Guest Lecturer, Dept. of Geography, Uluberia College

Dr. Lina Paria, Asst. Prof. Dept. of Physics, Uluberia College

Dr. Ratna Bandhyopadhyaya, Asst. Prof. Dept. of Chemistry, Uluberia College

Sri Jagabandhu Mondal, Guest Lecturer, Dept. of Commerce, Uluberia College

Paromita Dutta, Asst. Lecturer, Dept. of Commerce, Uluberia College